শরৎচন্দ্র

নন্দদুলাল চক্রবর্তী

ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
২রা মাঘ, ১৩৬৮

প্রকাশনা
নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত
ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড,
২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি ১০

নাটকের রচনাকাল
শুরু : ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭
শেষ : ১৬শে চৈত্র, ১৩৬০

প্রচ্ছদপট-অলংকরণ
প্রিয়গোপাল বাগক

ধারাবাহিক প্রকাশনা
প্রবর্ত্তক— বৈশাখ ১৩৫৯ থেকে
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১

মুদ্রণ
হেমন্তকুমার পোদ্দার
পোদ্দার প্রিণ্টার্স,
৪-এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

বঙ্ক-মাঙ্ক
১৩৬১

দুই টাকা

অপরাজেয় দরদী কথাশিল্পী

শরৎচন্দ্রের

স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

এই নাটকটির নায়ক অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এটি 'শরৎচন্দ্রের জীবন-নাট্য' নামে সাময়িক পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশনার এবং 'শরৎচন্দ্রের জীবনালেখ্য' নামে প্রথম মঞ্চ-রূপায়ণের একটি সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পূর্ণতর রূপ। কিন্তু, ইহা জীবনচরিত বা ইতিহাস নয়, নাট্যরূপে রেখায়িত একখানি আলেখ্য-সংগ্রহ। ঐতিহাসিক ক্রমপর্যায় আর সাল-তারিখের দুরূহ বেষ্টনী যতদূর প্রসারিত থাকে জীবনকাহিনীতে, ইহাতে ঠিক ততটা নেই—সে কাজ জীবনীকার বা ঐতিহাসিকের। চরিত্র ও তার বিকাশের প্রয়োজনে নাট্যলোকে চলে ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকতার সৃষ্টি। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া পরিণতির দিকে নাটকীয় গতি-প্রকৃতির দ্রুত-মন্থর অথচ অবাধ পদচারণা। নাট্য-সৃষ্টির মাধ্যমে তাই আলেখ্য রচনা করিতে গিয়া আমি সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়াছি।

সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ঘটনা প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্রের মোটামুটি জীবনকথা ও সাহিত্য সাধনা এই নাট্য রচনার উপজীব্য। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত কাহিনী ও তথ্যরাশির ভিত্তিতে এবং সমগ্র শরৎ-রচনা ও শরৎ-জীবনী বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থ ও নিবন্ধাবলী পাঠে আমার যা ধারণা জন্মিয়াছে, তাহাও ইহাতে অবলম্বন করা হইয়াছে নাটকের অধিকাংশ দৃশ্য-পরিকল্পনা, কিছু কিছু চরিত্র ও সংলাপ তাই আমার কল্পনা-প্রসূত। অবশ্য, শরৎচন্দ্রের নিজস্ব সংলাপও আছে।

সাহিত্যের ভাষা ও সংলাপ যে কোন ব্যবহারিক জীবনের কথ্য ও কথন থেকে সকল সময়ে কিছুটা ভিন্ন, এবং কাহারও জীবনচরিত বা জীবনালেখ্য রচনাকল্পে তাঁর জীবনের সমূহ রোজনামোচা সংগ্রহ করা যদিও বা সম্ভব হয়, (যদি অবশ্য তিনি তাহা নিত্য বজায় রাখেন) তো দিকে-দিগন্তে উদ্গীরিত তাঁর সারাজীবনের অসংখ্য সংলাপ মহাকালের জঠর থেকে অবিকল অবিকৃতভাবে টানিয়া বাহির করিয়া আনা কোন-ক্রমে সম্ভব নয়; এবং কষ্টার্জিত সেই সংগ্রহও সকল সময় সাহিত্য-সৃষ্টির

কাজে আসে না। তাঁদের রচনাবলী চিঠিপত্র বক্তৃতামালা থেকে তাই তাঁদের চিন্তাধারা ও রচনাভংগী সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা বা ভাব-কল্পনা করিয়া সাহিত্যের রঙে সেইমত রচিত হইয়া থাকে তাঁদের জীবন-নাট্য। অন্ততঃ, আমাদের দেশে এ পর্যন্ত এই রীতিতে জীবনালেখ্য রচিত হইতেছে। এগ্রন্থেও আমি সেই নীতির ব্যতিক্রম ঘটাইনি।

আলেখ্যের প্রয়োজনে রঙ-রেখার সমতা রক্ষা-প্রয়াসে আমি শরৎ-চন্দ্রের 'বিলাসী' গল্পটির কিঞ্চিৎ ছায়া অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি, এবং শুধু 'বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়' চরিত্রদুটিকে তাদের স্বনামে গ্রহণ করিয়াছি। ঘটনাটির উপর নিজ জীবনের প্রতিবিম্বন সম্বন্ধে গল্পের পাদটীকায় শরৎচন্দ্র এবিষয়ে একটা ইংগিতও রাখিয়া গিয়াছেন। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের বাঈজী প্রসঙ্গটি আমার ভ্রাম্যমান জীবনের এক হঠাৎ-পরিচিত তবলা-বাদক পশ্চিমা মুসলমান বন্ধুর নিকট থেকে ঘটনাসূত্রে শ্রুত ও সংগৃহীত। সে এক অভিনব বিচিত্র কাহিনী! 'গিনি'ত্বের প্রয়োজনে পাকা সোনায় যে পরিমাণ খাদের সংমিশ্রণা, আলোচ্য দৃশ্যটিতে আমি ঠিক ততটুকুই কল্পনার তুলি লাগাইয়াছি। 'পল্লীসমাজ-চরিত্রহীন'র যুগে একদা তীব্র আলোড়ন শুরু হইয়াছিল রক্ষণশীল সমাজে, 'সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা' প্রভৃতি প্রবন্ধের মাধ্যমে উগ্র সমালোচনা ও গালাগালির বন্যা বহিয়া গিয়াছিল শরৎ-সাহিত্যের বিরুদ্ধে; জবাবে অবশ্য বিদগ্ধ তরুণ-সমাজ 'সাহিত্যের স্যানিটারি ইনস্পেক্টর' আখ্যা দিতেও কার্পণ্য করেন নি!—নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি-মানসে রক্ষণশীল সমাজের জলন্ত প্রতিবাদরূপে আমি তাই 'অবতরণিকায়' দৃশ্য 'চরিত্রহীন' পোড়ানোর দৃশ্যটি পরিকল্পনা করিয়াছি, এবং পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে শরৎ সাহিত্যের ঐতিহাসিক স্থায়িত্ব ও জনপ্রিয়তা-বিষয়ক জনতার জবানি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি। নাট্যালেখ্য-র প্রস্ফুটনে বোধহয় নাট্যকারগণ এই স্বাধীনতাগুলি পাইয়া থাকেন।

শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গগণের মধ্যে যাঁরা বর্তমানে জীবিত আছেন বা নাই, এবং নাটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে তাঁদের মধ্যে যাঁরা বা যে সমস্ত চরিত্র এখানে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন—দৃশ্য ও সংলাপের মাঝে আমি তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে চেষ্টা করিয়াছি, কাউকে ব্যঙ্গ বা বিকৃত করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

তথ্য ও কাহিনী সংগ্রহে যে সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং যে সমস্ত বন্ধু ও সুধীমণ্ডলী তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি থেকে সমসাময়িক ইতিকথার অলিখিত অধ্যায় ও নেপথ্য বৃত্তান্ত নাট্যকারের গোচরীভূত করিয়াছেন, তাঁদের ঋণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়। সেই সুদীর্ঘ তালিকার মধ্যে থেকে বিশেষভাবে স্মরণ করি শরৎ-মাতুল শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথকে—দিনের পর দিন নাটক সম্বন্ধে শুধু আলোচনা ও উপদেশ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি, নাটকের প্রয়োজনে 'সমাপিকা' দৃশ্যের সম্মেলক সঙ্গীতটির রচনা ও সুর সংযোজনা করিয়া দিয়াছেন। উদীয়মান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী বন্ধুবর শিবকুমার চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের দুটি গান ও বাঈজীর গানখানি সুরারোপ করিয়া দিয়া আমার ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। প্রখ্যাত নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত ও ভাষা-সাহিত্যের সুপণ্ডিত মনীষী ডাঃ সুকুমার সেন নাটকটির আদ্যোপান্ত পাঠে ও উপদেশদানে তাঁদের অমূল্য সময় যেভাবে ব্যয়িত করিয়াছেন, তাতে তাঁদের এই সহযোগিতাও আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। প্রসঙ্গতঃ ধন্যবাদ জানাই শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দারকে—একমাত্র যাঁরই প্রচেষ্টায় সম্ভব হইয়াছে নাটকটির প্রকাশনা। আর ধন্যবাদ জানাই বাংলা ও বহির্বাংলার সেই সমস্ত পাঠক-পাঠিকাকে—যাঁরা নাটকটির ধারাবাহিক মুদ্রণের সময়ে পত্রিকা মারফৎ পত্রযোগে আমাকে জানাইয়াছিলেন অভিনন্দন।

কলকাতা,
১৩৬২।

নন্দদুলাল চক্রবর্তী

শরৎ-আকাশের গ্রহতারা

বিপ্রদাস গঙ্গোপাধ্যায়—শরৎচন্দ্রের ছোটমামা

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—আবাল্যের সঙ্গী ও অন্যতম মাতুল

মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়— ঐ

সরোজবাবু—জনৈক বন্ধু

গিরীন সরকার—রেঙ্গুনের বন্ধু, গভর্ণমেন্ট কন্ট্রাক্টর

যোগেন সরকার—ঐ সহকর্মী ও সাহিত্যিক

নিবারণ বন্দ্যো—ঐ, সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তি

নিশানাথবাবু—লেখিকা অনুরূপা দেবীর দেবর

মহাদেব সাহু—মজঃফরপুরের জমিদার

রাজেন্দ্র—দুঃসাহসী জীবনের পথ-প্রদর্শক

নীলু—ছেলেবেলার সঙ্গী

পিয়ারী পণ্ডিত—পাঠশালার গুরুমশায়

ট্যাপা—সর্দার পোড়ো

মৃত্যুঞ্জয়—জনৈক সমাজচ্যুত

চরণের বাপ—
রসিক—
কান্তপদ—
খুড়ো—
} গ্রাম্য মাতব্বর

বাচস্পতি
স্মৃতিরত্ন
ন্যায়ালঙ্কার
} সমাজপতি

শ্রীধর আচার্য
দর্পনারায়ণ ভট্টাচার্য
বামাচরণ
} পুরোহিত ও পণ্ডিতবৃন্দ

শ্যামাদাস চক্রবর্তী—জনৈক দুঃস্থ ব্রাহ্মণ

মিঃ হাজব্যাণ্ড—রেঙ্গুন প্রবাসী উচ্ছৃঙ্খল যুবক

মিঃ ফ্রেণ্ড—রেঙ্গুনের এক ভাগ্যান্বেষী

চক্রবর্তী—রেঙ্গুনের কারখানার মিস্ত্রী

ঘোষাল—
মাণিকলাল— } ঐ সহকর্মী
শেতলচাঁদ—

গৌরমাঝি—শরৎচন্দ্রের প্রজা

দু'জন গুণ্ডা, ভৃত্য, ডাক্তার, গ্রাম্য লোকজন

ধীরবালা—পাঠশালার সঙ্গিনী

শান্তিদেবী—প্রথমা স্ত্রী (চক্রবর্তীর মেয়ে)

হিরণ্ময়ীদেবী—দ্বিতীয়া স্ত্রী

বিলাসী—বেদেনী, মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী

গায়ত্রী— নিপীড়িতা বিধবা তরুণী

বাঈজী—

দুটি ছোট ছেলে-মেয়ে

অবতরণিকা

মঞ্চ অন্ধকার। শুধু রিণ রিণ করিয়া বাজিতেছে সুর-ঝঙ্কার। ধীরে ধীরে পাদপ্রদীপ জলিয়া উঠিল। দেখা গেল ঃ একটি প্রান্তর। সম্মুখে শিব-মন্দির। দূরে প্রবহমানা ভাগীরথীর একাংশ। মন্দিরের সম্মুখে একটি প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ড। হস্কায় কাঁপিতেছে পথিপার্শ্বের গাছপালা। সময়—সায়াহ্ন সন্নিকট। অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে ক্রোধোন্মত্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর জটলা।

বাচস্পতি—কোন ভয় নেই স্মৃতিরত্ন! এই ব্রাহ্মণ সমাজের পত্তন ক'রেচে আর, এই ব্রাহ্মণই তাকে বাঁচিয়ে রাখবে।···ওই দু'একজন সমাজবিরোধী লেখকের উস্কানিতেই যে এই সমস্ত ছোটলোক অন্ত্যজ ঝি বেশ্যা কুলটা দপদপানি ক'রে যাবে আমাদের চোখের ওপর—এ আমরা, সমাজপতিরা কিছুতেই বরদাস্ত ক'রবো না।

স্মৃতি—কখনো না!

ন্যায়া—ন্যায় বলেন···

স্মৃতি—[মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া] আহা-হা, বলি—ন্যায় তো তোমার ন্যায় কথা বলবেই হে ন্যায়লঙ্কা! এই "স্মৃতি"র কথা-ই ধরবো না কেন? বলি—কাউকে ছেড়ে কথা কয় নাকি··· এ্যা?—হেঁ·হেঁ···হেঁ, মনু—মনু!·· মহামতি মনু প্রবর্তিত বিধি, বিধান! দেখো দিকিনি, আমাদের আমলে কি চমৎকার গ্রন্থই না লেখা হোতো। তোমার গে—'সংসার-চিপিটকম্' 'সমাজ-লগুড়ম্'। যেমন জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ, তেমনি ভাষা।

কত আগ্রহে লোকে শ্রবণ ক'রতো! তোমার গো—এর জোরেই তো এতদিন এই সমাজ শাসন ক'রে এসেচি।

বাচস্পতি—সেই শাসন এখনও চলবে। পায়ের চটি পায়েই থাকে চিরকাল। যাক্ সে কথা—আর দেরি নয়। সেই চরিত্রহীন লেখকের কু-কীর্তির পূর্ণাহুতি দিয়ে দাও এই বহ্নি-কুণ্ডে। বইয়ের নামটাই বা কি—'চরিত্রহীন'! বাপ্‌রে বাপরে!... এ কলংক এখুনি জালিয়ে...

[পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুচর দল সেই আগুনে 'চরিত্রহীন' গ্রন্থ নিক্ষেপ করিতেছিল।]

স্মৃতি—নিশ্চয়ই! স্মৃতি, দায়ভাগ বাঁচাতেই হবে আমাদের। আমিই দিচ্চি ব্যবস্থা ক'রে। এই—তাড়াতাড়ি কর্‌না তোরা?

[স্মৃতিরত্ন 'চরিত্রহীন' গ্রন্থরাজির পূর্ণাহুতি দিতে ছুটিলেন]

বাচস্পতি [করজোড়ে ঊর্ধ্বমুখে]—দোহাই বাবা শঙ্কর বিশ্বনাথ, তোমার রাজ্যে এমনিধারা ব্যভিচার আর যেন কখনো চোখে দেখতে না হয়!

[শরৎচন্দ্র তাঁহার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে সেই পথে আসিয়া পড়িলেন]

সরোজ—[সবিস্ময়ে] কি ব্যাপার মশায়দের!...অকস্মাৎ জ্বলন্ত আগুনে এতগুলো বই...

স্মৃতি—[নির্বিকার চিত্তে] পুড়িয়ে ফেলচি।

শরৎ—পুড়িয়ে ফেলছেন? অপরাধ?

বাচস্পতি—গুরুতর অপরাধ—আর তার চেয়েও গুরুতর, লেখকের। সমাজের প্রতিটি লোমকূপে সে দূষিত জীবাণুর বিষ ঢেলে দিয়েচে!

শরৎ—দিন তো একখানা বই, কে লেখক দেখি।

স্মৃতি—[একখানি বই দিতে দিতে]—কে এক ব্রাহ্মণ-কুল-কলংক শরৎ চাটুয্যে! একটা কালাপাহাড়! নিন—দেখুন!

[সরোজ চমকাইয়া উঠিলেন, শরৎচন্দ্র হাসিয়া ফেলিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলী উন্মত্ত—তাহাদের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়িল না।]

সরোজ—তা বইগুলো পুড়িয়ে ফেল্লে কি কালাপাহাড় থামবে, না, শৃঙ্খলা ফিরে আসবে সমাজের?

স্মৃতি—নিশ্চয়ই আসবে। দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিলে তা' বাড়ে বই কমে না।

সরোজ—কিন্তু আইনের দড়াদড়ি দিয়ে তো দুর্নীতিকে বেঁধে ফেলা যায় না। সমাজবদ্ধ মানুষের মাঝে কেন দুর্নীতি এলো... মনের কোন বৃত্তিটা অকস্মাৎ পলকা হ'য়ে গেলো—কেন হ'লো, কোন্ চাহিদা অপূর্ণ রইলো, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার মূল কারণ অনুসন্ধান করতে হয়। আর, দরদী সাহিত্যের সেটাই হলো মর্মকথা।

স্মৃতি—বচন তো খুব মশায়ের! আইন বলে তবে কি কিছুই থাকবে না সমাজে, এ্যাঁ? যত্তো সব...

ন্যায়—ন্যায় বলেন...

বাচস্পতি [ক্রোধে] আরে রেখে দাও! লেখককে যদি একবার পাই, তো দেখিয়ে দি ন্যায়-অন্যায়ের বহরখানা...

শরৎ [নির্বিকার চিত্তে] আমিই লেখক। 'চরিত্রহীন' আমারই লেখা।

বাচস্পতি- তোমার লেখা! তুমিই নষ্টচন্দ্র?...তুমি...তুমি...তুমি...

সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁর হাত হইতে 'চরিত্রহীন'খানি ছিনাইয়া লইয়া আগুনে ছুড়িয়া দিলেন। এদিকে সকলের সমবেত চীৎকার...লম্ফ-ঝম্পে যুগপৎ সেথায় এক তাণ্ডব পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল। ক্রোধের মাঝে কথাগুলি হোঁচট্ খাইতেছিল,—কথা তো নয়, যেন বাক্যবাণ!

বাচস্পতি—তুমি সমাজের কি বোঝো হে ?···

স্মৃতি—চালাকির আর জায়গা পাওনি !···

বাচস্পতি—তোমার দৌড় তো দেখি ওই বস্তি···ঝি···আর, বেশ্যাপাড়া ! মানুষের খবর কী রাখো তুমি ?···ক'টা মানুষ দেখেচো—ক'টা লোকের সঙ্গে মিশেচো ?

স্মৃতি—ফের যদি এ রকম লেখো, তো···

ন্যায়—ন্যায় বলেন···

বাচস্পতি—আমি যদি যথার্থ ব্রাহ্মণের সন্তান হই···

স্মৃতি—এই উপবীত ছিঁড়ে শপথ ক'চ্চি—ত্রি-সন্ধ্যে গায়ত্রী-সাধা কর্‌করে যজ্ঞসূত্র।···

বাচস্পতি—এই শিখা উৎপাটন ক'রে অগ্নিদেবতার কাছে আহুতি দিয়ে বাচস্পতিনন্দন প্রতিজ্ঞা ক'চ্চে···

এক তরফা বিচিত্র বাক্য স্ফূর্ত্তির মাঝে ছিন্নোপবীত শূন্য-শিখ ব্রাহ্মণের দল সমস্ত বই আগুনে পোড়াইয়া তর্জন গর্জন করিতে করিতে সগর্বে প্রস্থান করিলেন। শরৎচন্দ্র নির্বাকভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। জ্বলন্ত আগুনে ঝর-ঝর করিয়া চোখের জল ঝরিতেছিল সরোজের।

সরোজ—না··না···না, আর আমি সইতে পারছি না শরৎদা !···এরা শুধু নাকটেপা প্রাণায়াম করলে, প্রাণটাকে চিনলে না !··· বুঝলে না সাহিত্য···জানলে না কি বিচিত্র আর কত অভিজ্ঞ এই গ্রন্থকারের জীবনটা···

বেগে বাহির হইয়া গেলেন। মঞ্চের ক্ষীণাভ আলোয় শুধু জাগিয়া রহিল করুণ সুরের ক্রন্দন।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দেবানন্দপুর। পথিপার্শ্বের এক ঘন-সন্নিবিষ্ট আম বাগান। কিশোর শরৎচন্দ্র ও তাঁর সমবয়সী সাথী ও সহপাঠিনী ধীরু ওরফে ধীরবালা পিয়ারী পণ্ডিতের পাঠশালা পালাইয়া বইবগলে দ্রুতপদে সেখানে প্রবেশ করিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। সময়—দ্বিপ্রহর অতীত।

শরৎ—দ্যাখ ধীরু, আমিও প্রতিজ্ঞা করচি—ওই ট্যাপার মাথায় যদি গাব্ব, পিলিয়ে না দিতে পারি তো, আমার নাম ন্যাড়া নয় বুঝলি ? আমাব ন্যাড়া নামে তোরা তখন ঘোল ঢেলে দিস্।

ধীরু—কেন মিছিমিছি ওর ওপর এতো রাগচ ন্যাড়া-দা !

শরৎ— বটে। অম্নি ওদিকে ওর দলে ঢলে পড়লি ?

রাগে ও বিরক্তিতে এক পকেট গুলি ও লাট্টু দূরে ছুড়িয়া দিয়া একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়া অভিমান করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ধীরু- ছিঃ। বড় উল্টো-বোঝো তুমি ! এই ন্যাড়া-দা—শোনো।

[শরৎচন্দ্র চাহিলেন না]

শোনো ব'লচি—এদিকে চাও···ওঠো···

শরৎচন্দ্র কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না, ধীরু একটু দেখিয়া কাছে গিয়া সস্নেহে তাঁর গায়ে হাত দিয়া কহিল—

ন্যাড়া-দা ?

শরৎ—[অভিমানভরে] আঃ ! কি বিরক্তি ! রাক্কুসি কোথাকার—যা চ'লে যা আমার সুমুখ থেকে।

ধীরু—[ক্ষুব্ধ অভিমানে] ও ! তা এতো যদি বিরক্তি লাগে তোমার, তো দু'বেলা বার বার ক'রে ডাকতে যাওয়া কেন শুনি ?… লজ্জা করে না ?

শরৎ—[উঠিয়া] বটে !

ধীরুর কাছে গিয়া তার গালে মুখে পিঠে কিল চড় মারিতে লাগিলেন ও সেই প্রহারের চিহ্ন তার স্থানে স্থানে ফুটিয়া উঠিল।

ধীরু—যাচ্ছি ! জ্যাঠামশাইকে ব'লে দিচ্চি ! তুমি রোজ রোজ পাঠশালা পালিয়ে দুষ্টুমি ক'রবে, আর ধ'রে ধ'রে মার দেবে আমাকে…! যাচ্ছি…যাচ্ছি আমি…

[দুম দুম করিয়া আগাইয়া গেল]

শরৎ—[অত্যধিক রাগিয়া তাহার পিঠে আরো গোটা কয়েক কিল বসাইয়া দিয়া]- যা… যা ! ব'লগে যা পোড়ারমুখি ! আমি অতো কারুর ভয় করি না।

গাছের আড়াল হইতে হুঁকা কল্‌কে বাহির করিয়া আনিয়া আপন মনে তামাক সাজিতে লাগিলেন। ধীরু কোনো কথা না বলিয়া আগাইয়া চলিল। শরৎচন্দ্র ধীরুকে একবার আড়চোখে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—

আমি যখন বেটাছেলে- আমার যা খুসি তা ক'রবো। ওঃ—আমায় আবার ভয় দেখান… দেমাক কতো ! কারুর ওসবের কোনো ধার ধারি না আমি—

ধীরু নিরুদ্বেগ-গতিতে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া তামাক কল্কে ফেলিয়া একটু আগের জেদী কিশোরালির বড়াই ভুলিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার একটি হাত ধরিয়া বলিলেন—

ধীরু…ধীরু…

ধীরু সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়া ফেলিল। শরৎচন্দ্র তাহাতে বিগলিত হইয়া তাহাকে কাছে টানিয়া পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—

কাঁদিস্‌নি ধীরু!—চুপ কর লক্ষিটি! আহা, কি দাগ প'ড়েচে গালে পিঠে, দেখো দেকিনি! আচ্ছা ধীরু, কেন বলতো আমাকে অতো রাগিয়ে দিস্ তুই—জানিস্ তো, রাগলে আমার কোনো জ্ঞান থাকে না!

ধীরু—[সমস্ত ভুলিয়া] তুমি যে বড় উল্‌টো বোঝো ন্যাড়া-দা?

শরৎ—আচ্ছা ··আচ্ছা, এবার থেকে খুব করে সোজা বুঝবো। তুই এখন যা তো ভাই -একটু আগুন চাপিয়ে আন দেখি কল্‌কেটায়?

ধীরু —ওমা! তুমি বুঝি তামাক খাও ন্যাড়াদা!

শরৎ দূর-র্! খাই কোথায়? খেয়ে দেখবো বলে মনে করিচি আজ। বাবা বাড়ি কেমন ক'রে হুঁকো টানে তাই দেখেই না! তাই তো লুকিয়ে লুকিয়ে যোগাড় করলুম এই হুঁকো কল্কে! তুই যা একটু আগুন নিয়ে আয় -

ধীরু তা' এই বাগানে আগুন কেমন ক'রে পাই বল্‌তো?

শরৎ— তোর অসাধ্যি কিচ্ছু নেই। তুই যা—আর কথা বাড়াস্‌নে।

ধীরু কল্‌কে লইয়া চলিয়া গেল ও একটু পরে কল্‌কের মাথায় আগুন চাপাইয়া ফুঁ দিতে দিতে ফিরিয়া আসিয়া হুঁকার মুখে সেটি বসাইয়া দিল। শরৎ অত্যন্ত খুসি হইয়া ধীরুকে কহিলেন—

এইজন্যেই তোকে এতো ভালো লাগে ধীরু! তোকে কিল চড় মারতে কত যে আনন্দ···

ধীরু—[হাসিয়া ফেলিয়া] বটে! আদরের কি ছিরি···আহা!

দু'জনে হাসিয়া উঠিল। ন্যাড়া হুঁকা টানিতে গিয়া বিষম কাশিয়া বিরক্তিতে সেটিকে দূরে ছুঁড়িয়া দিল।

[একটু পরে]—ন্যাড়া-দা!

শরৎ—কি।

ধীরু—শুনচি, তোমরা নাকি শিগ্গির ভাগলপুর চ'লে যাবে?

শরৎ—কে ব'ল্লে?

ধীরু—জ্যাঠাইমা সেদিন ব'লছিলো।

শরৎ—কে জানে। তবে, গেলেও আমি কিন্তু এখানে পালিয়ে আসবো—তোকে ছেড়ে কোথাও থাকতে·· আচ্ছা, তুই-ও চল্ না আমাদের সঙ্গে। বেশ হবে—

ধীরু—[ম্লানমুখে] আমায় যেতে দেবে কেন।

শরৎ—আচ্ছা···আচ্ছা। সে তখন দেখা যাবে। আর, কে-ই বা কোথায় যাচ্ছে—কোথা থেকে কি উড়ো কথা শুনে তুই মিছিমিছি মন খারাপ করচিস্।

ধীরু—তোমার না যাওয়া হ'লে তো ভালো-ই হয়। হে ভগবান, জ্যাঠামশায় জ্যাঠাইমার সুমতি দাও—ন্যাড়াদাকে তারা যেন এখান থেকে নিয়ে না যায়।

[উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও প্রণাম করিল]

শরৎ—কিন্তু ট্যাপাটার জ্বালায় যে এখানে টেঁকা যায় না দেখি!

ধীরু—সেই-ই তো হ'য়েচে মুস্কিল। কি করা যায় বলতো ন্যাড়া দা?

শরৎ—না, না, কথাটা তুই-ই ভাল ক'রে বুঝে ছাখ্ না। ট্যাঁপা কিনা সর্দার পোড়ো হ'য়ে চোক্ রাঙাবে, আর তার-ই কাছে পড়তে হবে! ওই শালার জন্যে আমিও বাড়িতে মার খাই···বকুনি খাই—তুইও খাস্। পণ্ডিতটাও একটা আস্ত আফিংখোর। ও পাঠশালায় আর আমরা পড়বো না—কি বলিস্?

ধীরু—তা' হ'লে তো ভালই হয়—কিন্তু, কেমন ক'রে হয় বলোতো ? বাড়িতে কি বলা যাবে ?

শরৎ—আরে, সে এই 'ন্যাড়া-দা' তোর সব মৎলব বাৎলে দেবে— কিচ্ছু ভয় নেই। হেঃ—সর্দার পোড়ো ! কিসের সর্দার ও বল্‌তো ?

ধীরু—[বিস্ময়ে] তাই তো !

শরৎ—[সোৎসাহে] তুই বুঝে ছাখ্ না কেন—ঘুঁড়ির সূতোয় মাঞ্জা দেওয়া—এইসান্ প্যাঁচ্ মেরে ঘুঁড়ি লটকানো…বাঁই বাঁই ক'রে লাট্টু ঘুরিয়ে অপরের লাট্টু দু'ফাঁক করা…বলি, আমার জুড়িদার কেউ আছে এ তল্লাটে ?

ধীরু—বটেই তো ! বটেই তো

শরৎ—বলি, মারো দিকিনি এইসান্ গুলি—কেমন আঙ্গুলখানা তোমার দেখি বাওয়া ! পনের কুড়ি হাত দূর থেকে এইসান্ টিপ ক'রতে হবে যে লাগবার সঙ্গে সঙ্গে অপরের গুলিখানা টক্কর খেয়ে দু ফাঁক হ'য়ে ছিটকে যাবে না ! তারপর তোমার নিজের গুলিটাকে আবার গাব্বু পিলোতে হবে। হ্যাঃ—চাড্ডিখানি কথা।

[গর্বে স্ফীত হইয়া উঠিলেন]

এ ছাড়া, তোমার তো ডিঙি-বাওয়া, পরের পুকুরে লুকিয়ে ছিপ ফেলে চ্যালা মাছ ধরা—কই, তুই ব্যাটা করতো দেখি ?

ধীরু—[আনন্দে] এ তুমি ছাড়া ন্যাড়া-দা, কেউ পারবে না—আমি 'ষাট্' ক'রে ব'লতে পারি।

শরৎ—তা'হলে বোঝো এখন—কার সর্দার পোড়ো হওয়ার যুগ্যি আছে। আর ওই সব 'বাঁয়ে ইলেক' 'ডাইনে ইলেক'

'কাঠাকালি' '.গাটা কালি' 'বক্ষেকালি' 'মুখে কালি' ওসবের কি বয়েস এখন—না, ওগুলো মানুষে করে! যত্তো সব।

ধীরু—তা' যা বলেচো দাদা!

অদূরে রাস্তায় পিয়ারী পণ্ডিত ও তাঁর পাশে পাশে সর্দার পোড়ো ট্যাপাকে দেখা গেল। তাঁহারা হন্তদন্তভাবে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে আসিতেছিলেন—

শরৎ—এই রে, ট্যাপা শালা আর পণ্ডিত মশাই এইদিকে আসচে দেখচি, বোধ হয় বাগানে আমাদের খোঁজ ক'রতে পারে।

ধীরু—কই দেখি—। [ঘন উদ্যানের ফাঁক দিয়া দেখিয়া] তাইতো, এইদিকে আসচে মনে হয় যেন। আমরা যে এখানে থাকবো, তা' কেমন ক'রে জানতে পারলে বল'তো ন্যাড়াদা? আর, আমাদের খোঁজে আসচে তাই বা বুঝলে কি ক'রে?

শরৎ—[হাসিয়া] বুঝ্‌লি ধীরু, ও শিকিরী বেড়াল [illegible] [illegible]খলেই চেনা যায়। যে কাণ্ড আজ বাধিয়েচি পাঠশালে—আসবে না। টিকিও শেষ, ট্যাপাও নিকেশ। যাক গে। হাঁ, বলিচিস্ বটে—আমাদের সন্ধান পেলো কেমন ক'রে। [একটু থামিয়া] জানিস্ ধীরু, ওই দাড়ির ভেতরে বুড়ো পণ্ডিতের যত শয়তানি মতলব, বুঝলি? ও যখন দাড়ি চুলকোতে থাকবে তখনই জানবি যে, ও দুষ্টবুদ্ধিতে শান দিচ্চে। ওই ভ্যাখ না—ভ্যাখ···

ধীরু—[পূর্ব প্রক্রিয়ানুযায়ী তাহা লক্ষ্য করিয়া]—তাইতো, এখন উপায় কি ন্যাড়া দা?

শরৎ—[সে কথায় কাণ না দিয়া] যদি ওর দাড়িটা কেটে দেওয়া যেতো! নেহাৎ আর পাঠশালায় যে যাবো না, নইলে একবার দেখে নিতুম—

ধীরু—এখন উপায় কি ন্যাড়া-দা, আমি পাঠশালাই বা ছাড়ি কেমন ক'রে? বুড়ো তো বাড়িতে ধাওয়া করতে পারে বলচো! আর ওই ট্যাঁপা, ওর পেটে পেটে······

শরৎ—ও শালার নিকেশ করচি আমি দাঁড়া না—

[পরক্ষণে একটা ঢিল লইয়া ট্যাঁপার উদ্দেশ্যে ছুড়িয়া দিল]

ধীরু - ন্যাড়া-দা···

শরৎ—শালা!—এইবারে! যাক্, এখন শোন্ ধীরু—আমি চল্লুম, বসন্তপুরের হাটবার আজ—ছিপ একটা কিনতেই হবে। ভাল ছিপটা আমার ভেঙে গেছে, মুকুয্যেদের পুকুরের ওই ম্যাবোয়া মিরগেলটা ঘায়েল করতেই হবে আমাকে।

ধীরু তা' না হয় ক'ল্লে। কিন্তু, বেলা যে গেছে—তুমি এখন যাবেই বা কি ক'রে, আর বাড়িতে বা কখন ফিরবে···রাত্তির বেলায় ·

শরৎ—সে ব্যবস্থা করেছি—নয়ন-দা আছে। তোর ভাবতে হবে না আমার জন্যে। আরে, ওরা যে এসে যায় দেখি এই বাগানের দিকে - চল্···চল্ চল্· ।

দ্রুত প্রস্থান। ভিন্ন পথে ধীরুর পলায়ন। উদ্যানের পথে বৃদ্ধ পিয়ারী পণ্ডিত ও তাঁহার পিছনে পিছনে ট্যাঁপার প্রবেশ।

ট্যাঁপা—[ভীতচকিতভাবে] দেখলেন তো পণ্ডিতমশাই—উঃ! আর একটু হ'লে মাথাটা আমার গিয়েছিলো আর কি! বাপরে বাপ—এ্যাঁ! এ নিশ্চয়ই ওই ন্যাড়ার কাজ। ও ছাড়া আর কেউ এ কাজ করতে পারে না।

পিয়ারী—তাইতো, আমার-ও-তো তাই মনে হয়। কিন্তু, গেলো কোথায় ওরা?

[অগ্রসর হইলেন]

ট্যাপা—[বাধা দিয়া শংকিতভাবে] যাবেন না পণ্ডিতমশাই··· ওদিকটিতে যাবেন না—। এই তাই আমরা এতক্ষণ এখানে আছি—হয়তো কোথা দিয়ে এক্ষুণি কি ক'রে দিতে পারে ও। পালাই চলুন—ওর হাতে প'ড়ে কি শেষে বেঘোরে জীবনটা দেবো ?

[উভয়ের প্রস্থান]

দূরে ঝোপের মধ্যে 'হেঁ···হেঁ' করিয়া উচ্চকিত হাস্যধ্বনি উঠিল। একটু পরে ধীরু বাহির হইয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল সেখানে।

ধীরু—হ্যাড়াদা·· আ··· হা · হা·· হাঃ·· হ্যাড়াদা।

মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ। সময়—দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ। গাঙ্গুলীবাড়ি, ভাগলপুর। খিড়কিঘাটের সন্নিকটস্থ একটি অরক্ষিত পোড়ো বাগান। লতাগুল্ম ইটপাটকেলে ভরা। শরৎচন্দ্র লাঠি দিয়া একমনে ইটপাটকেল সরাইতে ছিলেন। সহসা একটি গোখরো-শিশু বাহির হইয়া ফণা উদ্যত করিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি লাঠি ফেলিয়া খুসি মনে তাহার মাথার উপর একটি একহাত প্রমাণ বেলের শিকড় তুলিয়া ধরিলেন। ক্রুদ্ধ সর্প তাহাতেই ছোবল মারিল। সংগী নীলু একধারে একটি মাটির হাঁড়ি ও সরা লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সোৎসাহে হাঁড়িটি সেইদিকে আগাইয়া দিয়া কহিল—

নীলু—ন্যাড়া-দা……

ঠিক সেই সময়ে সহসা শরৎচন্দ্রের সমবয়সী ও সংগী মণিমামা সেখানে ছুটিয়া আসিয়া লাঠিটি কুড়াইয়া বাগ করিয়া ধরিয়া একটি ঘায়ে দংশনরত সর্পের ভব-বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। শরৎচন্দ্র 'হাঁ-হাঁ' করিয়া উঠিয়া তাঁহাকে কহিলেন—

শরৎ—হাঁ· হাঁ…হাঁ! ক্কি…ক্কি…কি ক'ল্লি বলতো মণিমামা।

মণি—বিশেষ কিছু নয়। ওর পরকাল আর তোমার ইহকালের একটা পাকা-পোক্ত ব্যবস্থা ক'রে দিলুম।

আপন কৃতিত্বে হাসিয়া উঠিলেন। নীলুর কম্পিত হাত থেকে হাঁড়ি ও সরাটী পড়িয়া ভাঙিয়া গেল।

শরৎ—বকামি করিস্‌নে। কি মুস্কিলে ফেল্লি বল্‌তো এখন—ছিঃ… ছিঃ…ছিঃ!

নীলু—ব্যাপার কি ন্যাড়া-দা? কত বড় ফাঁড়া থেকে মণিদা…

শরৎ—ফাঁড়া না তোর মুণ্ডু, –পরীক্ষাটা আমার মাঠে মারা গেলো!

মণি—পরীক্ষা!

শরৎ—হাঁ! অনেক কষ্টে এসব বিদ্যে শিখতে হয়,—এ বিদ্যে আছে 'সংসারকোষে'। যোগাড় করেছিলুম অতি কষ্টে—সেতো তুমি জানো, পড়েছিলুম গোটা বইটা—কিন্তু, তোমার জ্বালায় তা আমার কোনো কাজেই লাগলো না। ইস্‌—চুক্‌… চুক্‌…চুক্‌!

মণি—দেখো দেকিনি! বলি—এমন কাণ্ড তা আমি কি ক'রে জানবো। দেখলুম—এক আঝাড়ি যমের বাচ্ছা তোমার সামনে ফণা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েচে একেবারে—তাই না! তা কি

পরীক্ষাটা চালাচ্ছিলে বলতো? ও ইটপাটকেলের ভেতর খুঁজেপেতে আরো অনেক গোখরো যোগাড় ক'রে দেবো'খন—এখন ব্যাপারটা কি বলো দিকি?...

নীলু—আর ওই 'কোষ' বই না কিসের কথা ব'লছিলে, ওটাই বা জোটালে কেমন ক'রে কোত্থেকে!

শরৎ—অনেক দুঃখ্যু পেয়ে তবে ওর সন্ধান মিলে ছিলো। বুঝলি—নীলে? ওর নাম 'সংসারকোষ'!

নীলু—হ্যাঁ হ্যাঁ। তা 'সংসারকোষ' পেলে কেমন করে? কি আছে ওতে?

শরৎ—সেই কথাই তো বলচি। শোন্ তবে—দুঃখের কি আর অন্ত আছে! পাঠশালে থাকতে তো ঘাড়ে চাপলো যত সব—বোধোদয়, পদ্যপাঠ· নানান ঝামেলা! তার ওপরে আবার গুরুমশায়ের ছাল ছাড়ানো বেত...বাগান-কোপানো চাড়ের বহর! ওঃ—পাঠশালে পড়া তো নয়, একেবারে জল্লেদের (জহ্লাদের) মুখে পড়া।

নীলু—যা বলেচো ভাই। সব দেশের পাঠশালই দেখি ওই রকম!

শরৎ—হুঁ! তারপরে এলুম এখানে—মামার বাড়ি। ভাবলুম—যাক্, বাঁচা গেলো বুঝি! ওরে ব্বা-বা, আসতে-না-আসতে ঠুকে দিলে এরা ছাত্তোরবিত্তি ক্লাসে। ব্যাপার কি? না—সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাব সদ্‌গুরু আর ইয়া মোটা এক ব্যাকরণ। বাপ্‌স্! কি বরাত মাইরি—এ্যাঁ!

নীলু—(সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে) সত্যি ভাই, বড় কষ্ট! আমার কিন্তু এ-সবের বালাই নেই।

শরৎ—তোমাদের সে এক ভাগ্য! আর, শুধু কি পড়া—তোমার গো' প্রতিটি দিন স্কুলে পণ্ডিতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই

পড়ার আবার ঝাড়া পরীক্ষা দেওয়া। বল্ দেকিনি—এ কি কোনো ছেলের ধাতে সয়, এদেরও তো তা' বোঝা উচিত একটু!

নীলু—বটেই তো।

শরৎ—পালিয়েও কি ছাই নিষ্কৃতি আচে! অনেকবার তা ক'রেচি—কিন্তু আবার খুঁজে আনা, আবার সেই পড়ার ধরাকাট... আবার সেই চামড়া ছেঁড়ার জন্যে ওদের পড়ি কি-মরি ছুটোছুটি। মার খেয়ে খেয়ে আমারও রোক চেপে গেলো—ভাবতে লাগলুম, কি করা যায়—এমন কোনো মন্তোর-তন্তোর কি নেই যা ফুঁকে দিতে পারলে ওদের দফা-রফা করা যায়। ঘুরতে ঘুরতে মতলব ভাঁজতে ভাঁজতে বাড়িতেই একদিন ওই 'সংসারকোষ' বইটার সন্ধান পেলুম। ওদের লুকিয়ে সেটাকে টেনে নিয়ে যা চাইছিলুম তা' পেয়ে গেলুম ব্যস!

নীলু—সত্যি ন্যাড়া-দা?

শরৎ—হ্যাঁ রে। মণিমামাও জানে। আশ্চর্য বই মাইরি! ওর থেকে চমৎকার একটা মন্তোর শিখেচি—বড়দের শাসন এড়াতে চাও, কিংবা যে কোনো বিপদেই পড়ো না কেন, ওই মন্তোরটা যদি একবার তখন ফুঁকে দিতে পারো তো একেবারে অব্যর্থ!

নীলু—[উৎসুক হইয়া কি ন্যাড়া-দা? আমিও শিখবো, বল না ভাই?

শরৎ—শিখবি, বেশ। মণিমামা, সুরেন, সকলে শিখেচে। তুইও শেখ—শোন্!...“ওঁ, হ্রীং, হ্র্যাং হ্র্যাং রক্ষ রক্ষ স্বাহা।” এক মনে এই মন্তোরটা উচ্চারণ ক'ল্লেই তখন আর কোনো বিপদ থাকবে না।

নীলু—বাঃ, বেশতো ! তুমি আর একবার বলো ন্যাড়া-দা ।

শরৎচন্দ্র পুনরায় সেই মন্ত্র শুনাইলেন, সংগীটী দু' তিনবার তাহা আবৃত্তি করিয়া আয়ত্তে আনিয়া ফেলিল ।

শরৎ—শোন্ । তারপর একদিন ওই বইটা পড়তে পড়তে দেখলাম, এক জায়গায় সাপ বশ করার একটা মন্তোর লেখা রয়েচে ।

নীলু—সেই জন্মেই বুঝি তুমি পরীক্ষা…

শরৎ—হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! আমার বহুদিনের ইচ্ছেও ছিলো । আচ্ছা, সেবার আমার সাপে কামড়ানোর কথা তোর মনে আছে না ?

নীলু—খু-উ-ব ! কত ঝাড়্ ফুঁক্ হ'লো—বেঁচে গিয়ে তুমি বল্লে, মহাভারতের মিত্যুনজয় না কোন্ রাজার মতো তুমি সর্পেলা-যজ্ঞি ক'রে সব সাপ মেরে ফেলবে !

শরৎ—হ্যাঁ-হ্যাঁ ! জন্মেজয় রাজা তাই ক'রেছিলো,—তাই প'ড়ে আমি বলিছিলুম তখন । তা' মন্তোর যখন শিখিচি তখন এইবারে একদিন কববো সেই যজ্ঞ । এতদিন তো কোনো উপায়-ই খুঁজে পাচ্ছিলুম না ।

নীলু—তা' হ'লে তো তোমার ধন্যি ধন্যি প'ড়ে যাবে । তা' সাপ বশ করার কি মন্তোর ?

শরৎ—মন্তোর না হাতি ! এক হাত প্রমাণ একটা বেলের শেকড় যোগাড় করো—তারপর সেটাকে কোনো একটা বিষাক্ত সাপের ফণার কাছে তুলে ধরো, ব্যস্, বাছাধন তখুনি মড়ার মতো নির্জীব হ'য়ে যাবে ।

নীলু—এ্যাঁ ! তাই নাকি ?…ইস্, এমন একটা চমৎকার সুযোগ তো তোমার নষ্ট হ'য়ে গেলো । [ডানা ঝাপটানোর মত দুটি হাত নাড়িতে লাগিল]

শরৎ—যাক্‌গে—কি আর হবে, অন্য দিন আবার পরীক্ষা ক'রবো!
[মরা সাপটির দিকে চাহিয়া] যা বেটা সাপ, এম্নিও মরতিস অম্নিও মল্লি। তবে, সর্পযজ্ঞ আমি করবোই—সাপধরা আমাকে শিখতেই হবে।

মরা সাপটি লাঠির ডগায় তুলিয়া প্রস্থান। মনীন্দ্রনাথ সেই সঙ্গে চলিয়া গেলেন। নীলু বিস্মিতভাবে সেই পথে চলিবার উপক্রম করিতেই নেপথ্যে কার ডাক শোনা গেলো—

নেপথ্যকণ্ঠ—কে রে? কি হ'চ্চে রে ওদিকে?

নীলু—[সভয়ে বিড় বিড় করিয়া] হ্যুং হ্যুং রক্ষ রক্ষ স্বাহা! হ্যুং হ্যুং···

নেপথ্যকণ্ঠ—কে বিড় বিড় করে ওদিকে?

নীলু—সেরেচে! তবু ও যে তেড়ে আসে! হ্যুং হ্যুং মন্তোর ফুং ফুং ক'রে উড়িয়ে দেয় দেখি এ্যাঁ! কোন্‌দিকে পালাই—ন্যাড়াদা···ন্যাড়াদা···

(রাজেন্দ্রের প্রবেশ)

রাজেন্দ্র—কে রে তুই পালিয়ে যাচ্চিস্ ওদিকে?

নীলু—আমি! আমি···মানে···নীলু! এ্যাঁ! ওঁ হ্যুং হ্যুং রক্ষ রক্ষ স্বাহা।

রাজেন্দ্র—ওটা আবার কিসের মন্তোর! কে শেখালে রে তোকে? অতো ঢোক্ গিল্‌চিস্ কেন বাবা নীলে? রাজেন্দ্ররে যমে ভয় করে বাপ—নির্ভয়ে বল্ তুই।

নীলু—[অপেক্ষাকৃত সাহসী হইয়া]—আঁই···মানে—এ্যাঁ।·· মানে··· ন্যাড়াদা এটা···মানে···

রাজেন্দ্র—[হাসিমুখে] ন্যাড়া তোকে এটা শিখিয়ে দিয়ে গেছে, কেমন?

নীলু—হ্যাঁ! মানে ··

রাজেন্দ্র—কোথায় সে ?

নীলু—এই তো চলে গেলো ওদিকে। বললে—এই মন্তোরে সমস্ত বিপদ কেটে যায়···

রাজেন্দ্র—বটে! তা বিপদ তো তোর কাটলোই। খ্যাড়া তোকে মন্ত্র দিয়েচে, আমি দেবো তন্ত্র। তোকে আমি ডাকাত তৈরি করবো।

নীলু—[ভয়ে বিস্ময়ে]—ডা-কা-ত !

রাজেন্দ্র—[হাসিয়া] হ্যাঁ! মানুষ মারতে হবে না—মারের থেকে বাঁচতে হবে, মানুষের মার সহ্য করতে হবে। তোকে গড়বো আমি ডানপিটে ছেলে—বুঝলি ? আয় আমার সঙ্গে—।

বিস্মিত নীলুর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন।

মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল

তৃতীয় দৃশ্য

কয়েক বছর পরে।

আদমপুর। প্রবহমানা গঙ্গার একটি বাঁক—খাড়ির মত। তীরে বড় বড় গাছ—কোথাও বন, লতাগুল্মের ঝোপ। রাত্রিকাল। ভাঙা ভাঙা জ্যোৎস্না ডালপালার ফাঁক দিয়া পড়িয়াছে। সহসা ঝোপের আড়াল হইতে দুজন গুণ্ডা বাহির হইয়া আসিল। পরিধানে লেঙটের মতো মালকোঁচা আঁটা, মাথায় ফেট্টি, গলায় আটোসাটো তক্তি, তৈল মর্দনে সর্বাংগ পিচ্ছিল,—একটি গুণ্ডা আবার একটু লেঙচে চলে। হাতে খেঁটে লাঠি—লম্বা তেলকুচকুচে এক জোড়া

পাকান গোঁফে এদের চেহারাকে আরো ভয়াল করিয়া তুলিয়াছে। একবার এদিক-ওদিক দেখিয়া লইয়া দুজনে বলাবলি করিতেছিল।

প্রথম গুণ্ডা - কি বরাত রে বেচো! এ্যাঁ!—আজ সাত সাতটা রাত ভাগলপুরের বনবাদাড় গঙ্গার পাড় এমুড়-ওমুড় তোলপাড় ক'রে বেড়ালুম, কিন্তু কোনো আকাঁড়া হারামজাদার একটাও জেলেডিঙি ঘাটে ভিড়তে দেখা গেলো না, যে বউনি ক'রে গুরুর নামটা রক্ষে করি—পেটেও একটু দানাপানি দি! বলি—হারামজাদি গঙ্গানদী কি বাঁজা হয়েচে, না শামুক বিয়োচ্চে র‍্যা আজকাল?

দ্বিতীয় - [তেল চুকচুকে লাঠিটা কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে] নসীব! নসীব রে ল্যাঙড়া, সবই এই লল্লাটের লেখন! লইলে, মা শ্মশানকালীর নাম লিয়ে এই দুজ্‌জয় খেঁটে ছুঁড়ে দেলে কোন্ ইস্তিরির ভায়ের বাপের কি সাধ্যি আচে যে সে, রা কাড়বে আর দ্বিতীয় বারটি!

ল্যাঙড়া—হঁ! দেখ্‌লম্ তো সেবার—মাঝি বেটা ছেরেপ একটি ঘায়ে কেমন টুনিপাখির মতো ঘুরে পড়েছিলো। টাটকা রক্ত দল্‌দল্ ক'রে ভাসছিলো ঘোলা জলে।

বেচো—ও শালার কেঁচোর রক্ত।

ল্যাঙড়া—আবে দেখ্‌বে বেচো, গঙ্গায় আজকাল ষাঁড় ফল্‌চে মাইরি! দোহাই মা কালি, কিচ্ছু না দিস্ তো—তোর স্বোয়ামীর ওই সেরা বাহনটাই দিস্। তিরিভুবনটা ছেরেপ্ চ'ষে ফেলি—হাঁ! [মুখে সহর্ষ শব্দ]

বেচো—কই দেখি। [তথাকরণ]

ল্যাঙড়া—দেখ্। কিন্তু, তার আগে ষাঁড়ের শত্তুর এই মোষে-ই মারুক্

[লাঠি ছুড়িল]

বেচো—ষাঁড় নয় রে মামদো ভূত, ষাঁড় নয় ওটা। ডালপালার ফাঁক দিয়ে ঝোপের ওপর জ্যোছ্ছানা প'ড়েচে—হাওয়ায় নড়চে ওটা তোর মতো চারপায়ে। তুই যেমন ল্যাঙড়া, তেমি শালা—বোকা হারামজাদা!

ল্যাঙড়া—তবে রে সম্বন্ধীর পুত, বিল্লীকা বোনাই—বাপ তুলে তুই গালাগাল দিলি? আজ তোর একদিন কি মোর একদিন··

[ঝাঁপাইয়া পড়িল তাহার উপর]

বেচো—[প্রতিনিবৃত্ত করিয়া]—ক্ষ্যান্তো দে, ল্যাঙড়া—নিজেরা বেরথা খুনোখুনি ক'রে লাভ কি! আর তোরেই বা কি বলি—খালি পেটে কাঁহাতক মেজাজ ঠিক থাকে মানুষের।

ল্যাঙড়া—হুঁ।

বেচো—আরে দেখ্, এবার সত্যি দুটো লোক আসচে মাছের বোঝা নিয়ে। সাবধান—লাঠি অপয়া, এবার শালা কব্জি আর ছোরা। চলে আয় ইদিকে—।

[অন্তরালে অবস্থান]

মাছের থলি কাঁধে লাঠি হাতে নীলু সেইদিকে আসিতেছিল। সহসা গুণ্ডাদ্বয় তাহাকে অতর্কিতে আক্রমণ করিল, লাঠিটা নীলুর হাত হইতে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাজেন্দ্র পিছন দিক থেকে ছুটিয়া আসিয়া যুগপৎ কিল চড় পদাঘাতে দুটোকেই ভূতলশায়ী করিলেন।

নীলু—[উৎফুল্লমুখে]—কি গো বাস্তুঘুঘুর দল, বড় যে চুম্‌রে উঠেছিলে। —এবার? একপ্রস্থ লগিপেটা ক'রবো নাকি ওর ওপর?

একটা অল্পবয়সী বালকের মুখে এইরূপ শ্লেষোক্তি শুনিয়া গুণ্ডাদের পৌরুষে চিড়িক মারিল। দাঁত কড়মড় করিতে করিতে সগর্জনে কহিল—

ল্যাংড়া—বড্ড বেকায়দায় প'ড়ে গেছি, নইলে তোর কলজেখানা চুপসে ছেড়ে দিতুম রে বিট্‌লে ছোঁড়া। দাঁড়া তুই—[উঠিবার চেষ্টা করিল]

রাজেন্দ্র—[পুনরায় পদাঘাত করিয়া] বাচ্ছা ছেলের ওপর বীরত্বের বড়াই ক'রে লাভ কি? সাধ্য থাকে, আয় না এদিকে—মায়ের দুধের পরীক্ষাটা আর একবার ভালো করেই করা যাক।

প্রথম গুণ্ডাটি পড়িয়াছিল, দ্বিতীয়টি সহসা ছোরা বাহির করিয়া ছুটিয়া গেল।

বেচো—আব্ শালে…

কিন্তু আঘাত করিবার পূর্বেই রাজেন্দ্র তার কব্জিখানা এমন অতর্কিত বজ্রমুষ্টিতে চাপিয়া ধরিলেন, যে তার অবশ শিথিল মুঠি হইতে শেষে ছোরাখানা মাটিতে পড়িয়া গেল। নীলু সেটি কুড়াইয়া লইল।

রাজেন্দ্র—[হাত ছাড়িয়া] এবার?

বেচো—আরে! রাজুবাবু! তুমি—আপনি!

রাজেন্দ্র—হ্যাঁ, অবিকল। এবার কি ভাবে লড়তে আজ্ঞা হয়?

বেচো—ওঠ্‌রে ল্যাংড়া, উঠ্—কোথায় এসিছি! মাপ করো রাজুবাবু! ঠাহর কত্তে পারিনি। তিন দিন অন্ন জোটেনি—

মাথার ঠিক ছিলো না মোদের, দাঁতে দাঁত চেপে তাই শুধু ভরসা ক'রে ছিলুম জেলেডিঙির ওপর…

রাজেন্দ্র—বেশ ক'রেচো। এখন এই মাছগুলো নিয়ে আমায় কেতাথ করো।

বেচো—ই কি বলচো আপনি! না…মানে…

রাজেন্দ্র—[হুঁঙ্কার দিয়া]—না কি?

ল্যাঙড়া—ই যে স্বয়েং দেবতাজনির বাক্যি বটে আঁজ্ঞে!

রাজেন্দ্র—বটে! খুন করে ফেলবো—। কথাটি না ব'লে এই থলিটা নিয়ে শিগ্যির বিদেয় হও তোমরা।

বিস্মিতভাবে তাহারা মাছের থলিটি কুড়াইয়া লইল।

নীলু—এই ছোরাটা?

বেচো—দাও। ওটারে আজ ওই মা গঙ্গাব জলেই বিসজ্জন দুবো। পরণাম রাজুবাবু।

ল্যাঙড়া—আঁজ্ঞে, তা আমার ও বটেন।

[দুজনের প্রস্থান]

নীলু—হা-হা-হা! বেশ হলো, না রাজুদা?

রাজেন্দ্র—[কিছুক্ষণ পরে] হুঁ!

একটি গাছের তলায় ঢিবির মতো জায়গায় বসিয়া ফতুয়ার পকেট থেকে বাঁশী বাহির করিলেন।

নীলু—বাঁশী বাজাবে রাজুদা? বেশ হবে তাহলে, না…?

রাজেন্দ্র—আচ্ছা, শরতের খবর কিছু জানিস্? না আসচে এখানে, না যায় গানের আখড়ায়! কি যে হলো ওর কদিন থেকে…

নীলু—ইস্কুলে আমার সঙ্গে দেখা হয় বটে, তবে বিশেষ কথাবার্তা… তা'ছাড়া ডবল প্রমোশন পাওয়ার পর থেকে ন্যাড়াদা আরো যেন উঠে প'ড়ে লেগেছে।

রাজেন্দ্র—তা তো জানি। কিন্তু আসচে না কেন কদিন? কি বলে ও তাই বল্‌না তুই? ওদের বাড়িতে তুই যাচ্ছিস্ না? ওর দাদু তো গিয়েচে হালিসহরে—। তবে…? এই তো সুবিদে এখন…

নীলু—হুঁ। যাইও তো তাই প্রায়ই।—কতো জিগ্যেস করি ওকে… কতো কথা বলি। জানো রাজুদা, ওর মনটা দেখচি খারাপ কদিন থেকে। আমারও তাই এমন কষ্ট হয়…

রাজেন্দ্র—বটে! তা তুই তবে জিগ্যেস করিস্ না কেন—কি কারণটা?

নীলু—করি তো, বলে না যে বেশী কিছু! শুন্‌চি—বাড়িতে যেন ওদের কিসেব কি খিটিমিটি…। বুঝি না বাপু অতো শত…

রাজেন্দ্র—হুঁ।

আর কিছু না বলিয়া একমনে বাঁশী বাজাইতে লাগিলেন করুণ সুরে। খানিকক্ষণ পরে শরৎচন্দ্র প্রবেশ করিলেন। সহসা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া রাজেন্দ্রের বাঁশী বাজান বন্ধ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত যুগল চোখের নীরব চাউনি…মৌন ভাষার ব্যাকুল ইসারা। শরৎচন্দ্র রাজেন্দ্রের পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। রাজেন্দ্র তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলেন, তারপরে সোচ্ছ্বাসে আবার বাঁশী বাজান শুরু করিলেন।

রাজেন্দ্র—[কিছুক্ষণ বাজাইয়া] আর পারচি না ভাই, এবার তুই একটা গান গা' শরৎ।

শরৎচন্দ্র—ভালো লাগছে না রাজুদা। তুমি বাজাও।

রাজেন্দ্র—আমার ও কি ভালো লাগেরে একলা একলা, কতো দিন তোর গান শুনিনি বল্‌তো? আচ্ছা, তুই তবে বাজা, আমি গান করি বরং। [শরৎচন্দ্র নতমুখে নিরুত্তর]—কি হয়েচে রে? [সস্নেহে কয়েকটা ঝাঁকি দিয়া]—নে সোজা হয়ে ব'স্ দেখি। যা হয়েচে সব ঝেড়ে-মুছে ফেল্। বেটাছেলের আবার মন খারাপ কি..! মুইবো না, পড়বো তো একেবারে সমূলে—ঝাড়ে-মূড়ে·· বাস্!

শরৎ—[নত মুখে]—তোমাদের এবার ছেড়ে যাচ্চি বাজুদা।

রাজেন্দ্র—ছেড়ে যাচ্চি,—বটে। কী লাটুকে কথা-ই না ব'ল্লি। দেখ শরৎ, আমিও যাত্রা কবি —। ছেড়ে যাচ্চি,—ইস্‌স্। কই, যা দিকি তুই?···

শরৎ—নাটক করচি না বাজুদা। তোমার কাছে তা আমাব সাজে না।

নীলু—ছেড়ে থাকতে পারবে তুমি ন্যাড়াদা? বাজুদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাঙ সাঁতরানো, গাছেব ডালে শুয়ে রাত কাটানো, ডিঙি বাওয়া, মাছ ধরা। ছাড়তে তোমাব মন কেমন করবে না?

শরৎ—অমন ক'রে তুই আর আমাব দুঃখ বাড়াস্‌নে নীলু। রাজুদা, তুই, মণিমামা, সুরেন, গিবীন, উপীন—তোদেব কোনদিন ছাড়তে হবে মনে হ'লে

নীলু—তবে? [শরৎ চন্দ্র তথাপি নিরুত্তর]

রাজেন্দ্র—হুঁ! ব্যাপারটা তাহ'লে গুরুতর!—গান ও ভালো লাগচে না, বাঁশী ও ভালো লাগচেনা, ভালো লাগচে শুধু বাজুব কষ্ট দিতে—কেমন? সত্যি ক'রে বল্‌তো—কি হয়েচে, কোথায় যাবি···কতো দিনের জন্যে···?

শরৎ—[কম্পিত কণ্ঠে]—হয়তো, চিরদিনের জন্যে রাজুদা!

রাজেন্দ্র—[বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতো উঠিয়া দাঁড়াইয়া]—বটে! এক কোপে না কেটে জবাই করা!—ও··রে···! আপনার জন ফাঁকি দিয়ে সরে পড়বে, আর রাজেন্দ্র বেতো রুগীর মতো পিট পিট্‌ ক'রে চেয়ে থাকবে শুধু—! আচ্ছা, দেখ্‌ তবে—।

বাঁশীটা সেখানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দ্রুত পায়ে বনপথে চলিতে উদ্যত—

শরৎ—রাজুদা, ও রাজুদা—শোনো। গান আমি···

রাজেন্দ্র—[দূর থেকে]—তাল কেটে গেছে শরৎ। গান আর হয় না।

বালির চড়া ভাঙিয়া বনপথে অদৃশ্য

শরৎ—রাজুদা, রা-জু-দা [ছুটিয়া গেলেন সেইপথে]

নীলু—[সেই নির্জন নিশীথিনীর চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া] —ন্যাড়াদা? ও ন্যাড়া-দা? বাবে! রাজু-দা চ'লে গেলো, তুমি ও ছেড়ে চল্‌লে—আমি!···আমি তবে কোথায় থাকবো ···আমি এখন কি ক'রবো!···

বাঁশীটা কুড়াইয়া লইয়া ঝর্ ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—।

পর্দা নামিল মঞ্চে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কয়েক বৎসর পরের ঘটনা।

মালপাড়ার সাপুড়িয়া অঞ্চল। বিলাসীর ঘর,—বাঁশের বেড়া আর খড়ের আচ্ছাদন। মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসীর বর্তমান বাসস্থান। মৃত্যুঞ্জয়ের পরণে রঙীন কাপড়, মাথায় গেরুয়া পাগড়ী, গলায় রুদ্রাক্ষ আর পুঁতির মালা এবং শ্মশ্রু-গুম্ফের বিপুল সমাবেশ—মুখমণ্ডলে; দেখিলেই পুরাদস্তুর সাপুড়িয়া-সন্তান বলিয়া মনে করিতে দ্বিধা হয় না কাহারও। মৃত্যুঞ্জয়, বিলাসী ও শরৎচন্দ্র ঘরেব দাওয়ায় মাদুরের ওপর বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল। তিনজনেরই হাতের কব্জিতে সর্পদংশননিবারক মাদুলী বাঁধা। শরৎচন্দ্রের হাতে একটি অতিরিক্ত কবচ—তাঁহার পরিধানও কিছুটা রঞ্জিত এবং মুখমণ্ডলের স্থানে স্থানে শ্মশ্রু-গুম্ফের গুল্ম।

বিলাসী—[মুখ টিপিয়া হাসিয়া]—ঠাকুর, ও ঠাকুর? একটু সাবধানে নাড়াচাড়া ক'রো। ওসব কিন্তু ভয়ঙ্কর জানোয়ার!

মৃত্যুঞ্জয়—[প্রশংসমান দৃষ্টিতে]—বুঝলে, তোমার ঠাকুরটির এখন চারদিকে নামডাক। সব্বাই বলাবলি করে—হ্যাঁ, ন্যাড়া একজন গুণী লোক বটে! বছরখানেক সন্নিসি-অবস্থায় কামাখ্যা না কোথা থেকে একেবারে মন্ত্রসিদ্ধ হয়ে এসেচে।

এইটুকু বয়েসে এতো বড় ওস্তাদ আর দেখা যায় না··· আরো কত কি···

বিলাসী—[মুচকি হাসিয়া]—বটে! বটে! তাই নাকি ঠাকুর? তা' ঠাকুরের সন্নিসি হতে যেমন তর্ সয় না, সিদ্ধ হতেও তেম্নি দেরি লাগে না। রূপ গুণ জেদ—কোনটিই বা কম। লোকেরই বা অপরাধ কি!··· না কি বলো গো ঠাকুর?

শরৎচন্দ্র—যাঃ! কি যা' তা' বলচো!

বিলাসী—সত্যি ঠাকুর! গুণ কি তোমার কম! সে রাত্রে তুমি না আগলালে তোমার এই ওস্তাদজীর খুড়োটির সেই পালোয়ান দলটি আমাকে তো একেবারে মেরেই ফেলতো। এক বছর আগের সে ঘটনা আমার বেশ পষ্ট মনে আছে। আমার জন্তে কতো···

মৃত্যুঞ্জয়—আমাকেও তো শরৎ সেবার রোগ-শয্যা থেকেই একরকম পাঁজাকোলা ক'রে টেনে তুলে নিয়ে এলো এপাড়ায়···।

শরৎচন্দ্র—[প্রসংগ পরিবর্তনের জন্য বাধা দিয়া]—কিন্তু আমি ভাবচি কি জানো? ভাবচি—যে মেয়ে শুধু যে বস্তুটি দিয়ে ওস্তাদজীর মতো এমন একটি ছেলের হৃদয় জয় ক'রে তাকে এতো বড় একটা দুঃসাহসের কাজে নামিয়ে আনতে পারে, সমাজের রক্তমাংসের মানুষগুলো সেদিন তার দিকে চোখ মেলে চেয়ে দেখলো না···তার অন্তরটা বুঝতে চাইলেও না একবার! জাতিটাই শুধু তাদের কাছে বড় হ'য়ে রইলো চিরকাল—

বিলাসী-[একদৃষ্টে কিছুক্ষণ শরৎচন্দ্রকে দেখিয়া লইয়া]—আচ্ছা ঠাকুর, একটা কথা জিগ্যেস করি—বামুনের ছেলে, মাথার মণি, লেখাপড়া শিখেচো—দুদিন বাদে সমাজের মাথায় গিয়ে

ও বসবে, কিন্তু সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে হঠাৎ তুমি কেন এই হেনস্তে সাপুড়ের কাজ শিখতে এলে বলতো ?

শরৎচন্দ্র—আমাকে কি তুমি আঘাত করতে চাইচো ?

মৃত্যুঞ্জয়—আঃ—বিলাসী !

বিলাসী—না, কাউকে আঘাত দেওয়া আমাব স্বভাব নয়।

শরৎচন্দ্র—বেশ, তবে শোনো, সমাজের কথা যখন তুললে, তখন বলি,—ঠুনকো সমাজ সম্বন্ধে আমার ধ্যানধাবণার খবর বোধ হয় সেই রাত্রেই কিছু পেয়ে থাকবে, আব তার বেশী জানাবার হয়তো এখন প্রয়োজনও নেই। জানো বৌঠান—ছেলেবেলা থেকে সাপ সম্বন্ধে আমার দুটো ভয়ানক সখ ছিলো। একটি হচ্ছে—গোখরো কেউটে ধরে ধরে পোষা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে—মন্ত্রসিদ্ধ হওয়া। এই সাঙ্ঘাতিক সখ মেটাতে গিয়ে ছেলেবেলায অনেকবার অনেক দুর্ঘটনায় পড়তে হয়েছে আমাকে। কিন্তু আমার ভাগ্য যে এমন সুপ্রসন্ন হয়ে উঠবে এতো তাড়াতাড়ি···

বিলাসী—[মুচকি হাসিয়া]—এমন একসঙ্গে নাগ ও নাগিনী-কন্যা লাভ হবে···

মৃত্যুঞ্জয় মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। শরৎচন্দ্র লজ্জায লাল হইয়া উঠিলেন।

শরৎচন্দ্র—যাও। এমন ক'ল্লে কিন্তু আমি এখনি চ'লে যাবো।

বিলাসী—এতো সহজে কি ছেড়ে যাওয়া যায় ঠাকুর ! কামিখ্যের মায়াবিনীদের জাল যদিও বা কাটা যায়, সাপিনীদের নিঃশ্বাস সহজে এড়ানো যায় না···বড়ো পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলে এরা—কার আঁজ্ঞে, না···নাগিনী-কন্যার আঁজ্ঞে।

মৃত্যুঞ্জয় ও তার এই শেষোক্ত কথাটি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে

বলিতে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত রসিকতায় যোগ না দিয়া পারিলেন না।

শরৎচন্দ্র— বটে!

বিলাসী—হ্যাঁ গো ঠাকুর, দেখচো না—তোমার ওস্তাদজীও শেষ পর্যন্ত জাতি-ধর্ম ছাড়তে বাধ্য হলেন, তবুও এই নাগিনীদের আওতা ছাড়তে পারলেন না। তা' ছাড়া…

মৃত্যুঞ্জয়—ওই দ্যাখো, কথায় কথায় খেয়াল নেই আদৌ—ক্রোশ দেড়েকের পথ, বেলা এদিকে প'ড়ে এসেছে…

বিলাসী—কেন, কোথায় যাবে আবার?

মৃত্যুঞ্জয়—সাপ ধরার একটা বায়না নিয়িচি। ঘরের মেঝেয় গর্ত কেটেচে …নায়েকদের মুখে যা শুনলুম, তাতে বিষধর সাপেরই বাসা হবে সেখানে! ঘরে কেউ থাকতে পারচে না!

শরৎচন্দ্র - [আনন্দে] হুর্‌রে! চলো যাই ওস্তাদ।

বিলাসী - গর্তের মুখটা কি রকম? কাগজ-টাগজ ফেলে…

মৃত্যুঞ্জয়—সে সব জিজ্ঞাসাবাদ করিচি। ইঁদুর-গর্ত যে নয়—সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

বিলাসী—সাপ-সাপিনী দুটো থাকাও বিচিত্র নয়।

মৃত্যুঞ্জয়—হতে পারে।

বিলাসী—দেখো, ও বাপু দরকার নেই গিয়ে।

শরৎচন্দ্র—সে কি কথা!

মৃত্যুঞ্জয়—কিছুদিন থেকে তোমার দেখচি এসবে আর একটুও উৎসাহ নেই! বায়না পেলেই তুমি খালি বাধা দেবে—আজ শনিবার, কাল মঙ্গলবার, পরশু - অথচ, আমাদের পেশা এই! বলি— নগদ এতগুলো টাকা কোথায় পাবো…কে দেবে বলোতো?

বিলাসী—মিছামিছি লোক ঠকানো আমার ভালো লাগে না। তা'ছাড়া আমাদের খাবার ভাবনাই বা কি!

মৃত্যুঞ্জয়—সবাই তো করে, এতে দোষ কি?

বিলাসী—করুক গে সবাই।

শরৎচন্দ্র—আহা, এতো ভয়ই বা কিসের বৌঠান?

বিলাসী—বেশ তো ঠাকুর, বলে—একা রামে রক্ষে নেই সুগ্রীব দোসর!

শরৎচন্দ্র—দোসর না হয় হলুম, কিন্তু, সাপ ধরায় তোমারই বা এতো খুতখুতনি কেন?

বিলাসী—বারে, তুমি সাপের যুগল ভাঙবে—তোমার আনন্দ হচ্চে! কিন্তু কেউ যদি অম্নি করে আমাদের যুগল ভেঙে দেয়, তখন আমার কি হবে বলো তো···

শরৎচন্দ্র—দূর, তোমার যত সব অনাছিষ্টি কথা। যাকগে—কিন্তু লোক ঠকানোর কথা কি বলছিলে না? এতে ঠকানোটা হলো কোন্ জায়গায়? এতে তো লোকের বরং উপকার হয়। তোমাদেরও লাভ হয়। এই যেমন শেকড় বিক্রি, সাপ ধরা, সাপ খেলানো···

বিলাসী—সেইটেই তো মানুষ ঠকানো। সমস্তই হচ্ছে ওস্তাদের চালাকি। যে সাপটা নিয়ে তোমরা খেলা দেখাও, তাকে তো আগেই তোমরা কায়দা করে রাখো। বাড়িতে আগে লোহার শিক পুড়িয়ে তার মুখে বারকযেক ছ্যাঁকা দিযে তাকে এমন সন্ত্রস্ত করে রাখো যে, খেলাবার সময় ঝুড়ি থেকে বার করে তাকে শিকড়ই দেখাও আর একটা কাঠিই দেখাও না কেন, সে তখন তোমাদের ভয়ে পালাতে পথ খুঁজে পায় না। সবই জানিতো।

মৃত্যুঞ্জয় হাসিতে লাগিল

শরৎচন্দ্র—আহা! খুব তো বল্লে দেখি! আর, নতুন সাপের বেলা? তাদের কেমন ক'রে ধরি, তারা কেমন করে বশ হয়? মন্ত্রের বুঝি কোনো গুণ নেই…[ঝোঁকের মাথায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন]—ওই যে মন্তরটা…

"ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন—
মনসা দেবী আমার মা—
ওলট্‌পালট্ পাতাল-ফোঁড়—
ঢোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে
—দুধরাজ, মণিরাজ।
কার আঁজ্ঞে—বিষহরির আঁজ্ঞে।"—

বিলাসী—[হাসিয়া]—ঠাকুর, তোমার ওস্তাদ বলেছেন যে তুমি মন্ত্র-সিদ্ধ। কিন্তু, সিদ্ধ না হলেও আমি জাত-সাপুড়ের মেয়ে। ও মন্ত্র-তন্ত্র, ভাল-মন্দ, গুণাগুণ—সবই বুঝি, জানি আমি সমস্ত মারপ্যাঁচ। কি জানো—সাপ ধরা হচ্ছে শ্রেফ্ হাতের কায়দা—আর, ধরতে ধরতে একটা অভ্যাস, সাহস বেড়ে যাওয়ার ফল শুধু। তারপর, বুনো সাপটাকে বাড়িতে ধরে এনে তার বিষদাঁড়া ভেঙে দাও তোমরা—সে তো তখন থেকেই নির্জীব হয়ে পড়ে। পরে আর কামড়াবেই বা কি, আর কামড়ালে কি-ই বা হবে! খালি ওস্তাদ সেজে লোকের চোখে ধুলো দেওয়া বৈ-ত নয়!

হাসিতে লাগিল পুনরায়

শরৎচন্দ্র—[বিস্ময় ও বিরক্তিতে]—তোমার আজ কি হয়েচে বলোতো? শুধু শুধু ধান ভানতে শিবের গীত—ধীরুর মতো তুমিও দেখচি বড় একগুঁয়ে—! আচ্ছা—বলো দিকি, শুভ কাজে কেন এতো বাগড়া দিচ্চো বৌঠান?

বিলাসী—বাগড়া নয়। কিন্তু, এই পাপের দণ্ড একদিন বেশ ভাল করেই দিতে হবে আমাদের। আমার মন বলচে—আজকের এইকাজ বন্ধ থাক, কেমন যেন এক বিপদের ছায়া চোখের সামনে ভাসছে আমার।

মৃত্যুঞ্জয়—বায়না নিয়েছিলাম। তা' ছাড়া, তারাও সাপ ধবে নিয়ে বিপদে পড়েচে বড়ো··

শরৎচন্দ্র—আজকের দিনটা শুধু চলো, লক্ষ্মীটি।

বিলাসী—[মুচকি হাসিয়া]—ছাড়বে না যখন, তখন চলো ঠাকুর। সাপ ধরার বাতিক তোমারও আজ পেয়ে বসেচে।

শরৎচন্দ্র—চলো ওস্তাদ! অতি কষ্টে রাজি করিয়েচি বৌঠানকে।

বিলাসী—কিন্তু ঠাকুর, একটু সাবধানে খুঁড়ো ঘরের মেঝে।

শরৎচন্দ্র—সে তুমি নাগিনী-কন্যে বিষহরি যখন স্বয়ং উপস্থিত থাকবে সেখানে—তখন আর পরোয়া কিসের।

হাসিতে হাসিতে উঠিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের হাত হইতে ডুগডুগি লইয়া বাজাইতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময়ে কোথায় কড়কড শব্দে বজ্রপতনের শব্দ হইল। চমকাইয়া উঠিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিলেন। বজ্র-গর্জন তখনো চলিতেছিল।

মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কয়েক মাস পরের ঘটনা।

নেড়াবটতলা। সকালবেলা। চরণের বাপ, রসিক, কান্তপদ প্রভৃতি গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর ধরণের ব্যক্তির জটলা সেখানে। তাহাদের আকার-প্রকার কথাবার্তা সম্পূর্ণ বিচিত্র ধরণের।

চরণের বাপ - না বাপু, পাল্লুম নি আর! গাঁয়ে এখন বাস কত্তে পারে কোন শালা! চোদ্দপুরুষের চুলোয় আগুন দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে এবার।

রসিক—আহা, ঠাণ্ডা মাথায় কথাটা এখন পাঁচজনের সামনে রাষ্টো করো না কেনে—ব্যাপারটাব ভাঙুরখানা একবার বুঝি!

কান্তপদ তা' সে নিশ্চয়ই—ঠিক কথা!

চরণের বাপ—আরে বাপু, বাগানের আমটা কাঁটালটা আনারসটা যদি একটা দাঁতেই না কাটতে পাল্লুম তো, শালাব বাগান ক'রেই বা লাভ কি—আর সে দেশে বাসই বা করি কেমন ক'রে! বলি, এই নিয়ে কি দিন রাত্তির খিস্তিখেউড় কাটবো, না সমাজের মাথা হ'য়ে তা' করা উচিত?

কান্তপদ—যথা কথা।

চরণের বাপ—আর শুধু কি বাগান? কয়েকদিন আগে দেখি—কি, যে গোটা পুকুরের মওতাত মওতাত মাছগুলোই লোপাট!

রসিক - তা' কথাটা যখন পাড়লে চরণের বাপ, তখন আমার আখ্যেন-টাও শুনিয়ে দি এই সঙ্গে। বড় পুকুরপাড়ের অতগুলো

খেজুর গাছের আর একটিরও মাথা আস্ত নেই—কোথাকার রাহুর দল এসে যে ঘাড় ভেঙে ভেঙে মেথি খেয়ে যাচ্চে ফি রাতে…ওঃ! গাছগুলোর দিকে দিষ্টি পল্লে চোখির জল আর বুকি থামতে চায় না।

কান্ত—তা একটু তক্কে তক্কে…

রসিক—সে আর তুমি ব'লে দেবে কান্তপদ! কিন্তু, কখন যে ওরা আসে আর কখন যে সমস্ত লোপাট্ ক'রে দিয়ে যায়…

চরণের বাপ—আমার বিশ্বাস, এ সমস্ত ন্যাড়ার দলের কীর্তি। ওদের যোগসাজস ছাড়া…

রসিক—বিচিত্র কি। ওদের অসাধ্যি কিচ্ছু নেই…

কান্ত - আমার কিন্তু মনে হয় বাপু,… ন্যাড়া ও দলের মধ্যে নেই। দুষ্ট হলেও ওটা পড়াশোনায়…

চরণের বাপ—তুমিও যেমন! আমার ছেলে বলে, ওটা পড়াশোনায় কিচ্ছু নয়·

কান্ত—[সহাস্যে] তোমার ছেলে পাশ কত্তে পারলে না কেন?

চরণের বাপ—ও কথা থাক। কিন্তু ন্যাড়াকে পাশ না করিয়ে উপায় আছে মাষ্টারদের! জীবনের ভয় তো আছে! যা দস্যি—পাঠশালে সেবারে তো পিয়ারী পণ্ডিতকেও ন্যাজেগোবরে কবে ছেড়ে দিয়েছিলো—হেঁ!

কান্ত—অতো চটা তুমি ওর ওপর কেন বলোতো চরণের বাপ? তোমার বাড়ির সেই কেলেঙ্কারির ব্যাপারে যখন কেউই সৎকারে যেতে রাজি হলো না… তখন ওর দলই সবার আগে

চরণের বাপ—বড়ো তোর ফট্‌ফটানি কান্তে। বুঝলে রসিক—আজকাল ওটা চোরাই মালের ভাগবাঁটরা পাচ্ছে কিনা ওদলের কাছ থেকে, তাই অতো…

কান্ত—মুখ সামলে কথা বলবে চরণার বাপ। ভাগ নিতে কারা যায়, তা আমি জানি। ন্যাড়া তোমাদের পথে বাদ সেধেছিলো কিনা··· খুড়োও তোমাদের লোভ দেখিয়ে তার কার্যসিদ্ধি করেচে···

রসিক—লোভ আবার কি? মৃত্যুঞ্জয় যদি একটা মালের মেয়ে ঘরে আনে···

চরণের বাপ—সমাজের মাথা হয়ে ওই গাড়লের মতো তা আমাদের মুখ বুজে সয়ে যেতে হবে!

কান্ত—টাকার লোভই যে বড় উস্কানি। সইবেই বা কি করে। যাক্ গে—কিন্তু মালের মেয়ে কি আর সাধে এনেছিলো মৃত্যুঞ্জয়টা। বিলাসী আর যা হোক—তার প্রাণ ছিলো, দয়া-মায়া ছিলো। মৃত্যুঞ্জয়ের আহা বলতে সংসারে কে-ই বা ছিলো···

চরণের বাপ—কেন, খুড়ো?

কান্ত—আহা-হা! কতো দরদ খুড়োর! অতো বড় অসুখে পড়লো, খুড়ো একবার তার বাড়ির তিরিসীমানা মাড়ালো না। জ্ঞাত শত্তুর তো, মুখেয়ে ছিলো সুযোগের অপেক্ষায়। ভাবলে—বিনি চিকিচ্চে, বিনি খেজ্‌মতে, বিনি পথ্যে শত্তুরটা মারা যায় তো যাক্। বিরাট সম্পত্তির ষোলো আনা সব্বোগেরাস্ তখন করা যাবে নির্বিবাদে! কিন্তু বিলাসী সেবা করতে আসায় খুড়ো পড়লো মুস্কিলে। রটালে বদনাম তোমাদের সমাজপতির কাছে। বশ করলে সব্বাইকে টাকার লোভ দেখিয়ে। রুগ্ন মানুষটার বাড়ি চড়াও হলে তোমরা, ঘুঁগরি মেরে ছুটে গিয়ে মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুললে। ভাগ্যিস্! ন্যাড়ার দল তখন সেখানে গিয়ে পড়েছিলো! মানুষ ছুটো সেদিন না হলে খুন হয়ে যেতো আর কি!··

চরণের বাপ—দেখলে···দেখলে রসিক, হারামজাদার কেমন সরুমেশে রটনা!

রসিক—বাঘের মুখে পা বাড়িয়েচিস্ কান্তে। ভালো হবে না বলচি!

কান্ত—সে কি আর বুঝি না রসিকদা!

চরণের বাপ—বড়ো চ্যাটাং চ্যাটাং কথা হয়েছে তোর কান্তে। কিছু বলি না ব'লে, নইলে তোর হাঁড়ির খবর আর এ চাকলার কারো জানতে বাকি আছে নাকি! আমি বলে তাই এখনো খাতাবাতা দিয়ে রেখেচি—না কি বলিস রে রসকে?

কান্ত—রসিকদাকে আর সাক্ষী মানতে হবে না। সে গুড়ে তোমাদের বালি পড়েচে। মেয়েটার চার হাত এক ক'রে দিয়েচি—বাকি পুত্তুরটি। তা সে বেটাছেলে-শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে বড়োটি হয়ে সমাজের মাথায় জুতো মেরে বে ক'রে আসবে।

[দ্রুত প্রস্থান]

চরণের বাপ—দেখলে, দেখলে রসিক? কালকেব কান্তে—তার কথাটা কি রকম! আচ্ছা, আমিও দেখে নেবো···একঘরে করবো ওকে·ভিটেয় ঘুঘু চবাবো। যথার্থই যদি আমি বাপের ঔরসে···

[সহসা মৃত্যুঞ্জয়েব খুড়াকে সেই পথে আসিতে দেখা গেল। তাহাকে দেখিয়া দুজনের মুখ চোখ সঙ্গে সঙ্গে অন্যভাবে পরিবর্তিত হইয়া গেল। কণ্ঠস্বরে যেন তাতারসি ঝরিতে লাগিল।]

রসিক—এই যে খুড়ো, তোমার কাছেই আমবা যাচ্ছিলুম। বলি—খুড়ো হচ্চে আমাদের সমাজের মাতব্বর, তায় এখন ওই হেনেস্তোটার হক্কের সম্পত্তির ষোলো আনা ভোগ-দখলীকার?

খুড়ো—মানে! ওতো আমারই হস্তের জিনিষ। রথলীকার কি নতুন নাকি?

রসিক—হেঁ…হেঁ…হেঁ! তা এটা খুড়োর যথা কথা।

চরণের বাপ—যাক…। হ্যাঁ, কি ব'লছিলুম খুড়ো—মৃত্যুঞ্জয়টা নাকি শেষ পর্যন্ত অপঘাতে মরেচে…কোথায় সাপ ধরতে গিয়ে নাকি সাপে কেটেই…

খুড়ো—আরে হ্যাঁ…হ্যাঁ, ওর যদি না অপঘাতে মৃত্যু হবে, তো হবে কার? বলি—পুরুষ মানুষ, সাপুড়ের মেয়ে কেন—তুই যাকে খুসি অমন একটা ছেড়ে দশটা ঘরে নে' আয় না! হবে না হয় একটু নিন্দে মন্দ! কি যায় আসে তাতে, বয়েস কালে অমন সবাই ক'রে থাকে। কিন্তু, তার হাতে তুই ভাত খেয়ে জাত জন্ম খুইয়ে মরতে গেলি কেন? নিজেও মলি, আর আমি নালতের মিত্তির বংশ, আমার ভাইপো হয়ে তুই কিনা আমার মাথাটাও হেঁট করে দিয়ে গেলি সমাজে! হায়-হায়-হায়! হিঁদুর ছেলে, না পেলে এক ফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হলো একটা ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু!

রসিক—বাপরে! বাপরে! লুচি নয়, সন্দেশ নয়, পাঁটার মাংস নয়—একেবারে হাঁড়ি-সেদ্ধ ভাত! নাঃ—কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না। বলি—এর কি কোনো প্রাচিত্তির আছে!…বলো না গো চরণের বাপ?

চরণের বাপ—কোথাও নেই। দায়-ভাগে তা লিখবে কি করে! হেঁ…হেঁ…হেঁ! বা-বা, রামতনু মুখুজ্যের পৈতে—আমার নিজের মুখে মুখে ফেরে!

খুড়ো—তোমরাই বলো তো বাবা।

রসিক—হেঁ…হেঁ…হেঁ! এদিকে বিধিরও কি সুক্ষ্ম বিধেন গ্যাখো।

শুনলুম তো, ছোঁড়াটা মরবার সাতদিনের মধ্যে নাকি মাগিটাও বিষ খেয়ে মরেচে।

খুড়ো—আরে, নষ্টা মেয়ে,—ধরণী অতো পাপ সইবে কেন? এখন বোঝো, কেন শত্তুরটার অসুখে আমি ডাক্তার-বদ্দি ডাকিনি! বলি—আমার কি কোনো সামর্থ্য ছিলো না?

রসিক—বটেই তো।

চরণের বাপ—শাস্তর মতে এখন ওদের উভয়েরই নরকবাস। খণ্ডাতে অবশ্য খরচ মাত্র সতের কাহন। কিন্তু তোমার ভাইপো যখন··

রসিক—তা আর বলতে। উপায় কি! আত্মার শুদ্ধি তো করাতেই হবে খুড়ো।

খুড়ো—আচ্ছা বাবা, আমার একটু বিশেষ কাজ···ও আর একদিন তখন·· হেঁ···হেঁ···হেঁ···

[তাহাদের আর কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া দ্রুত-পদে প্রস্থান।]

রসিক—কি ব্যাপার চরণের বাপ! সট করে যে স'রে গেলো। বড্ড ব্যস্ত-সমস্তভাব দেখি আজকাল। কই, বাড়িতে একবার যেতেও তো বল্লে না?

চরণের বাপ—ও লোকটা কি কম খব্বিষ, রসিক? একেবারে চশমখোর যাকে বলে। দেবো দেবো করে একটা পয়সাও ঠেকালে না এই একটা বছরের মধ্যে। মৃত্যুঞ্জয়ের আর যা হোক প্রাণ ছিলো, তা বাপু বলতেই হবে। শুধু ভেবেছিলুম, বলি—চাপচোপ দিয়ে যদি ওদের এই ঝগড়া বিবাদের সুযোগে সমাজের নামে কিছু হাতড়ানো যায়।

রসিক—সে তুমি বলে দেবে চরণের বাপ! মৃত্যুঞ্জয়টা পট করে মরে গিয়ে ··

চরণের বাপ—যাক গে ! গরসভুক্ত জিনিষ গিলবো ঠিকই একদিন। একটু দেরি হবে—এই যা !

রসিক—হুঁ ! চলো এখন। ওদিকে আবার পদ্ম-বাঁড়ির সেই ব্যাপারটার হেস্তনেস্ত করার দিন আজ। কতো কাজ যে মাথায় চাপিয়েচে এরা ! ওঃ ভগবান ! তুমি তো সির্জন করেই খালাস। এদিকে সমাজের যে কি ঠেলা…

[উভয়ের প্রস্থান। খানিক পরে কিছু তরি তরকারি সঙ্গে লইয়া কান্তপদকে সেই পথে আসিতে দেখা গেল। খুড়ো ভিন্ন দিক হইতে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া ডাক দিল—]

খুড়ো—কে যায়, আমাদের কান্ত না ?

কান্তপদ—আঁজ্ঞে হাঁ।

খুড়ো—তোমার কাছেই আমি যাচ্ছিলুম কান্ত।

কান্তপদ—আমার কাছে ! ব্যাপার কি খুড়ো ?

খুড়ো—বড় সমিস্যেয় পড়িচি বাবা। এখন তুমি ছাড়া নান্য পন্থা ! ওই চরণার বাপ আর রসকে যত নষ্টের মূল। ওদের পাল্লায় পড়ে সেবার ··[কৃত্রিম শোকে জল আনিবার চেষ্টা করিতে করিতে] ওরে মিতুন্-রে, মরেও গেলি…মেরেও গেলি ! তোরে আর কি দুষবো। শাস্তর মতে উদ্দেশ্যে একটা প্রাচিত্তির দিয়ে ইহকালের পাপটা তোর পরকালেই খণ্ডে দিতে পারবো। তুমি কি বলো গো কান্ত—মানুষ যদি একটা দোষ করেই ফেলে…

কান্তপদ—[সবিস্ময়ে] বটেই তো ! নিশ্চয়ই !

খুড়ো—[কাছে আগাইয়া গিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে] বলি, বুড়ো বয়সে এই বিষয় সম্পত্তিটা এখন আমাকেই তো দেখতে হবে…

সাঁঝের বেলায় সাতপুরুষের ভিটেখানায় একবার পিদিমটাও তো দেখাতে হবে—না, কি বলো হে? হিঁদুর ভিটে! বলি—তুই-ই না হয় মরেই বাঁচোয়া…

কান্তপদ—যথার্থ।

খুড়ো—এ্যাই! আমারই ভাইপো মেয়েটাকে তো ইস্তিরি বলেই স্বীকার করে নিয়েছিলো—মনের মিলই আসল, মন না মতি! না কি বলো গো‥

কান্তপদ—বিলক্ষণ।

খুড়ো- এ্যাই। তা' সে যাই হোক—ও দুজনের পাপ আমি খ'ণ্ডে দোবো।

কান্তপদ এখন কথাটা কি তাই এবার বলুন।

খুড়ো—বলচি। মানে—বাস্তুঘুঘু যে আবার এর মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করচে রে বাপ! অবিশ্যি, তুমি আচো বলেই ভরসা নাহলে, রসকে আর চরণার বাপ তলে তলে যা মতলব পাকাচ্চে—

কান্তপদ—ভাবনা কি খুড়ো…আইন আছে না? মগের মুল্লুক নাকি? হক্কের বিষয় তোমার—সাধ্যি কি ওদের…

খুড়ো—তাই তো বলি বাবা, না হলে আমার বলে এখন কাশীবাসের বয়েস। তবে পিতিপুরুষের বিষয় ছেড়ে গেলে আর সন্ধ্যেটি জ্বলবে না।

কান্তপদ—বটেই তো! [কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া]—খুড়ো, একটা কাজ কল্লে হয় না? গ্রামের মুখও বেঁধে দেওয়া যায় তা' হলে।

খুড়ো—ক্কি…ক্কি বাবা? বেশতো, তাই হোক্ না।

কান্তপদ—মানে, মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাণটা বড়ো ভালো ছিলো—ছেলেটা নিজে না খেয়ে ইস্কুলের ছেলেদের খাওয়াতো‥ দিতো…থুতো। পাড়ার ছেলেরা এখনো ওর নাম কত্তে পাগল!

খুড়ো—আহা ! মিত্যুনরে…

কান্তপদ—তা' আমি বলছিলুম কি—ওর নামে তুমি যদি একটা পাঠশালা খুলে দাও খুড়ো, তা'হলে গেরামের মুখ মেরে দেওয়া যায় এক চালে…

খুড়ো—কথাটা মন্দ বলিস নি বাপ, তবে ··মানে ..খরচাটা বেশ···মানে···

কান্তপদ—তা' একটু হবে খুড়ো। অবিশ্যি, মিত্যুনের সম্পত্তির তুলনায় সেটা সামান্য···

খুড়ো—[ধূর্ত্তের হাসি হাসিয়া] - গ্রামের ছেলেপিলে মানুষ হবে, এর চেয়ে আর ভালো কাজ কি আছে ! তবে হ্যাঁ···মাষ্টারও তো…

কান্তপদ কেন, ওই ন্যাড়া ছেলেটাই মাষ্টারি করবে। দশনামি কাজে ওর নাম খুব · সে শত্তুরটারও বন্ধু ছিলো . ছেলেমহলে ওর খুব খাতির···

খুড়ো—কিন্তু, তাকে আর পাচ্চি কেমন করে কান্ত ? বিলাসীর সেবারে মারধোর করা নিয়ে সে যা আমার ওপর খাপ্পা হয়ে আছে।

কান্তপদ—কাজটা কিন্তু খুড়ো সত্যিই ভালো হয়নি ! যাকগে—কিন্তু এখন যেন তেন প্রকারে তাকে আনার ব্যবস্থা করো খুড়ো—

খুড়ো—উপায় নেই বাপ ! তারা সবাই এখন আছে ভাগলপুরে।

কান্তপদ—হুঁ ! আমিতো এ খবর জানতুম না . এখন তাহলে দেখি ভেবে চিন্তে ! যা হয় একটা উপায় করে দেবো বৈকি।

[নেপথ্যে কান্তপদ'র ছেলে তাহাকে হাঁক দিল]

কা-ছেলে মুখুজ্যে বাড়ীর ওরা পদ্মদিদিকে মেরে ফেলচে বাবা…শিগ্যির এসো তুমি—

কান্তপদ—দেখো দিকি খুড়ো ! চরণার বাপটা হয়েচে যেন গেরামের লাটসাহেব ! যাচ্চি রে···

[দ্রুত প্রস্থান]

খুড়ো—যাও—যাচ্চি আমি, হারামজাদাদের·· [তাহার চলিয়া যাইবার পর]···যাক্, এটাকেও বাঁধা গেলো। ওদিকেও হলো ভালো। এখন নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করুক তো হারামজাদারা। এদিকে শরৎ ছোঁড়াটাও ভালয় ভালয় গ্রাম ছেড়েছে। ওই একরোখাটাকে নিয়েই যা ছিলো ভয়। ···বাঁচা গেলো এখন। হেঁ পাপ কি সয ? ওঃ ভগবান, তুমি নিশ্চয়ই আছো বাবা···

[আকাশের দিকে চাহিয়া করজোড়ে প্রণাম করিল। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। ভাগলপুর গাঙ্গুলীবাড়ি। শরৎচন্দ্রের পাঠচর্চা ও রাত্রিবাসের আস্তানা। পুরাতন জীর্ণ পরিমণ্ডল। একধারে ছিন্ন দড়ির খাট—উপরে সংক্ষিপ্ততম বিছানা। খাটের নিচে তামাকের সরঞ্জাম। অন্যদিকে ষ্টোভ, কেটলী, চা-কফির টিন, জলের কুঁজো, গ্লাস। খাটের পাশে পুরানো কাঠের বুক-শেল্‌ফ। এপাশে একটা ভাঙা চেয়ার ও ছোট টেবিল। টেবিলে বই খাতা দোযাত কলম। রাত্রি। টেবিলের ওপর একটি জলন্ত মোমবাতি। শরৎচন্দ্র তন্ময়ভাবে লিখিতেছিলেন। ঝামরো চুল। শ্মশ্রুগুম্ফের গুল্ম।

ঘোষক : এই এদেশের মানুষ এই তাদের পল্লী· এই তো সমাজ। কৈশোর ও যৌবনে বাস্তবের কঙ্করময় পথ ও প্রান্তর পরিক্রমা

করে, সমাজের আলো-আঁধারে কক্ষ ঘুরে বাঙালীর সুখে-দুঃখে মিলনে-বিচ্ছেদে দোষেগুণে গড়া বিচিত্র জীবন-পরিচয় সংগ্রহ করলেন জীবন-পথিক শরৎচন্দ্র। আত্ম-দহনের অভিনব আলোকে শুরু হলো তরুণ স্রষ্টার অমর স্বপ্ন-সৃষ্টি। প্রচ্ছন্ন আত্মকাহিনীকার উত্তর জীবনের শ্রীকান্ত, রাজেন্দ্র-চরিত্র থেকে আহরণ করলেন ইন্দ্রনাথের অপূর্ব প্রতিচ্ছায়া,—সৃষ্টি হলো মৃত্যুঞ্জয়, সাহজী, 'পল্লী-সমাজে'র পটভূমি। অভিভাবক মণ্ডলী জানলেন না যৌবনের এই নিভৃত সাহিত্য-সাধনা। জানলেন মহাকাল। আর কয়েকজন আবাল্যের সঙ্গী। ধীরে ধীরে রচিত হলো —'বাসা, অভিমান, কাশীনাথ, বোঝা, বড়দিদি, চন্দ্রনাথ, দেবদাস, শুভদা..'

[সহসা 'খুট' করিয়া শব্দ হওয়ায় ছিন্ন হইল শরৎচন্দ্রের তন্ময়তা, স্তব্ধ হইল ঘোষকের কণ্ঠ। শরৎচন্দ্র চাহিলেন সেইদিকে—]

সুরেন্দ্রনাথ তুমি এখনো লিখচো!

শরৎচন্দ্র—সুরেন! ও, সময় হয়ে গেছে নাকি! প্রমথ, গিরীন, যোগেশ, পুঁটু—সবাই এসে গেছে?

সুরেন্দ্র—[হাসিমুখে]—না…না। সাহিত্যসভা তো সেই দুপুরের পরে!

শরৎ—ও। তা তোমার চান-খাওয়া হয়ে গেছে?

সুরেন্দ্র—নাঃ! তোমার মাথা দেখচি খারাপ হয়ে গেছে। সবে তো এখন সকাল! এই দেখো দিকি?

[জানালা খুলিয়া বাতি নিবাইয়া দিলেন। প্রভাতের এক ঝলক আলো ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল।]

শরৎ—[অসহায় দৃষ্টিতে] তাইতো বটে! তাহলে এখন কি কার সুরেন?

সুরেন্দ্র—[মমতাপূর্ণ কণ্ঠে] কি আর ক'রবে। সারারাত ধ'রে লিখেও যখন তোমার আয়েস মিটলো না…

শরৎ—না…না। বিশ্বাস করো—প্রথম রাতটা একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম ·

সুরেন্দ্র—বেশ করেচো। ক্ষোভ রেখে আর দরকার নেই। বাকীটা তবে পূর্ণ করো, আমি বরং চলি।

শরৎ—শোনো কথা! আরে তা কি হয়? বোসো তুমি। লেখা আমার হয়ে গেছে হে। কতক্ষণ এসেচো তুমি?

সুরেন্দ্র—বেশ কিছুক্ষণ হলো বৈ কি।

শরৎ—চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে! আমায় তুমি ডাকলে না কেন?

সুরেন্দ্র—সুযোগ পেলাম কখন? বা—বা,—ওদিকে থ্যাকারে, ডিকেন্স, হাক্সলে, হেনরীউড, মেরী করেলী'র ওই সমস্ত মোটা বই, আর এদিকে শ্বাপদসঙ্কুল গোঁফদাঁড়ির মাঝে তোমার এই গম্ভীর মূর্তি! যা অবস্থা…

শরৎ—যাও। কি যা তা'…

সুরেন্দ্র—[হাসিমুখে] যা' তা'! বেশ- তোমার কথা-ই মানলাম। তুমিই বলো—কলেজে ঢুকেচো, তবে আবার তুমি রাখচো কেন এই বিষম দাড়ি চুল? এন্ট্রান্সের সময় না হয় একটা কারণ ছিলো। তা সেও তো তুমি দিদির প্রতিজ্ঞা-মতো মানতী চুল দাড়িগুলো বাবা তারকনাথের শ্রীচরণে সমর্পণ করে এসোচো……

শরৎ—আরে, ও এবার কেটে ফেলবো একদিন। সময় হ'চ্ছিলো না—। এবার আর মায়ের কোনো মানতী নেই এসব নিয়ে।

সুরেন্দ্র—উঁহু! ও কথা ব'ললে এখন ছাড়ছে কে? বাবা তারকনাথের ছোঁয়াচে সামগ্রী যখন আবার গজিয়েচে তোমার মাথায়—আর

বাবারও ধন্যি গোঁ বটে! এতো ছেলের এতো কিছু থাকতে বাবার কৃপাদৃষ্টি পড়লো কিনা...

শরৎ—[হাসিয়া]—সামান্য চুলের ব্যাপার নিয়ে কেন অযথা টানাটানি সুরেন্দর? এতো আর কেশ নয়...বেণী ও নয়, যে...

সুরেন্দ্র—বটে! তা এবার তবে পাণ্ডুলিপি ধ'রেই টানাটানি করি। রাত ভ'র কি নতুন লিখলে দেখি?

শরৎ—ওসব এখন দেখাবার মতো হয়নি সুরেন।

সুরেন্দ্র—তোমার তো ওই এক বুলি। 'কাশীনাথ'র মতো অমন সুন্দর গল্প লিখে...

শরৎ—না সুরেন, ভুল ভাঙলো সেবার 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' শুনে। তাই ঠিক করেচি—যতদিন না রবীন্দ্রনাথের মতো গল্প লিখতে পারবো, ততদিন কোথাও ছাপাবার চেষ্টা করবো না।

সুরেন্দ্র—তোমার দেখচি সবই অদ্ভুত।

শরৎ—হয়তো তাই। এটা বোধ হয় আমার পিতৃদত্ত! বাবার অসমাপ্ত রচনা—তাঁর গল্প, উপন্যাস, কবিতা, লুকিয়ে পড়তে পড়তে সাহিত্যে আমার আগ্রহ জেগেছিলো। রচনাগুলোর সমাপ্তি কল্পনা ক'রতে গিয়ে কি কষ্টে যে আমার রাতের পর রাত কেটে গেছে—তাও তুমি শুনেচো।

সুরেন্দ্র—হ্যাঁ। তারপর তুমি জোগাড় করলে—'নবীন, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, মাইকেল, ভবানী পাঠক, উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা!' লেখা শুরু ক'রলে, আমাদের শুনিয়ে ব'ল্লে—তোদেরও লিখতে হবে।

শরৎ—হ্যাঁ। এখন আমার ধারণাও পাল্টিয়ে গিয়েচে। এই ক'বছরে অনেক কিছু দেখেচি...সংগ্রহও কিছু কিছু হয়েচে

সুরেন্দ্র—একটা কথা তোমায় বলবো শরৎ? রাখবে—?

শরৎ—অমন ক'রে বলচো কেন? কোন্ কথাটা তোমার রাখিনি সুরেন? কোন্‌টা অকথিত আছে তোমার কাছে···

[নেপথ্যে ভুবনমোহিনী দেবীর কণ্ঠ পাওয়া গেল—'খোকা?']

—ওইরে, মা আবার ডাকচে কেন দেখি সকালে! বোসো—আসচি।—যাই মা।

[প্রস্থান। সুরেন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিগুলো দেখিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে শরৎচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন—]

—খাও। মা মনসার পেসাদ। তুমিও এখানে আচো শুনে দুজনের জন্যে দিলেন।

সুরেন্দ্র—এখনো! সাপটা তো মারা হয়েছিলো কবে—সেই তোমার এন্‌ট্রান্স পরীক্ষার সময়!

শরৎ—হ্যাঁ। মা এখনো কিন্তু নিয়মিত পূজো দিয়ে যাচ্ছেন। মার ধারণা—কি জানি কখন কোন দোষে বাস্তুদেবতা বাস্তুনাগ যদি কুপিত হ'য়ে ওঠেন!

সুরেন্দ্র—দাও পেসাদ। দিদি এবাড়ির লক্ষ্মী। তাঁর কাছে কেউতো ছোট নয়—কেউ নয় অবহেলার।

[খাইতে লাগিলেন]

—শরৎ বলো, এবার যা জিগ্যেস ক'রবো বল্‌ছিলাম। তোমার ডিহরী থাকার গল্প শুনেচি। এবার বলো তোমার দেবানন্দপুরের কাহিনী। কি অভিজ্ঞতা সেখানে···

শরৎ—[নতমুখে খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া]—শুনবে? কিন্তু, কি ব'লবো—সে যে প্রতিদিনের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দিয়ে তৈরী অন্তর্যাতনার ইতিকথা! ভারি মর্মন্তুদ ঘটনা সে যে সুরেন! শুধু দীর্ঘ নিঃশ্বাস আর চোখের জলে ভরা! দুঃখের সে যে কী

রুদ্ররূপ দেখেছি—টাকার জন্যে…চাকরির চেষ্টায় বাবার একদিকে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা…সংসার অচল…মাসের পর মাস আমার ইস্কুলের মাইনে জুটছে না…ক্ষণে ক্ষণে পাওনাদার মহাজনের নাছোড়বান্দা তাগিদ। ভিটেটাও…। ঠাকুমা এই অবস্থায় চোখ বুজলেন। খবর শোনা গেলো, দাদামশায় হালিসহরে দেহ রেখেছেন! সশঙ্ক অবস্থায় সেদিন পায়ের তলা থেকে যেন মাটিটিও স'রে গেলো আমাদের সংসারে…

সুরেন্দ্র—ওঃ! ভগবান!

শরৎ—পালিয়ে গেলাম সুরেন। বাড়িতে আর টি"কৃতে পারলাম না। মিলিয়ে গেলাম বহু বিচিত্র মানুষের ভীড়ে।…অসংখ্য নর নারীর সংস্পর্শে এলাম—গ্রামে গ্রামান্তরে দুর-দুরান্তিকে!… তাইতো বলছিলাম—লিখবো এবার জীবনের কথা, যদি লিখতেই হয়, লিখতে পারি কোনদিন। আমাদের আশে পাশেব লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ—তাদের দুঃখ বেদনা, ভাঙাগড়ার ইতিহাস, সমাজ-সমাজপতি সমাজ-পরিত্যক্ত—এই আমার সাহিত্যের উৎস। শোনো সুরেন—আমরা সৃজন ক'রবো নতুন সমাজ…শাশ্বত সাহিত্য। মনে পড়ে একটি সাপুড়ে মেয়েব কথা। জাতিতে সে বুঝি হীন,—কিন্তু কি প্রাণ, কি প্রেম, কি সেবা তার মানুষের জন্যে! স্বামী হারালো… সমাজ হারালো, তবুও মানুষকে ভালবাসতে ভুললো না। মরবার সাতদিন আগে আমার হাত ধ'রে অনুরোধ ক'রলে—'ঠাকুর, আমার মাথার দিব্যি রইলো, এই মানুষ ঠকানো সাপুড়ে খেলা আর তুমি কখনো ক'রো না।' জানো সুরেন—মানুষ সত্য, ভালবাসা সত্য…আর সবচেয়ে মর্মান্তিক সত্য বর্তমানের এই সভ্য সমাজ!

[সারাভারতের উৎপীড়িতের প্রতিচ্ছবি যেন প্রতি-বিম্বিত হইল তাঁহার সম্মুখে! কম্পিত কণ্ঠ… অশ্রু সজল চক্ষু—। সুরেন্দ্র অবাক-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে— ।]

[মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল ।]

চতুর্থ দৃশ্য

কিছুকাল পরে।

ভাগলপুর। গাঙ্গুলীবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখ। অনতিদূরে মহাধুমধাম করিয়া জগদ্ধাত্রীপূজা চলিতেছে। ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিতে গাঙ্গুলীবাড়ি সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলিতেছিল।

শ্রীধর আচার্য—আহা ভটচায না না, ব্যাপারটা…বলি…

দর্পনারায়ণ—কি বলবে হে তুমি ?…বলি, এর আবার বলাবলির কি আছে! আমার কাছে ওসব ঢাক্-ঢাক্ গুড়্-গুড়্ নেই। আমারও প্রতিজ্ঞে আছে - যথার্থ ই যদি নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণের ঔরসে আমার··

বামাচরণ—[ছুটিয়া তাঁহার নিকট গিয়া]—আহা-হা, করেন কি…করেন কি ভটচায মশাই ? একটু ক্ষান্ত হতে আজ্ঞা হোক্। এই মধ্যাহ্নসময়ে শুভ কাজে…মায়ের শুভাগমন আজ বাড়িতে… একে ব্রাহ্মণবাড়ি…তায় আপনারাও খাঁটি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত…

সকলে--বটেই তো! সেই জন্যেই তো একটা ফয়সালার···

বামাচরণ—আঁজ্ঞে হ্যাঁ। সেই ব্যবস্থাই হবে, আমি যাচ্ছি···ছোটবাবু··· ছোট···

[দৌড়িয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। একটু পরে হন্তদন্তভাবে শরৎচন্দ্রের ছোটমামা বিপ্রদাস গঙ্গোপাধ্যায় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁর পরিধানে গরদের কাপড়, অঙ্গে চন্দনচিহ্ন, কপালে রক্ত-ত্রিপুণ্ডক- স্কন্ধে শুভ্র উপবীত।]

বিপ্রদাস--ব্যাপার কি! কিসের গণ্ডগোল হলো?

বামাচরণ—গণ্ডগোল···মানে, বড় মুস্কিল হয়েছে ছোটবাবু!

বিপ্রদাস—মুস্কিল! মুস্কিল-আসান অভয়া কৈবল্যদায়িনী মায়ের শুভাগমন বাড়িতে···কোনো গণ্ডগোল তো থাকতে পারে না! ব্যাপারটা কি···

শ্রীধর—ব্যাপার আর কিছুই নয়, শুধু মানে··

[গাঙ্গুলীবাড়ির আরো কয়েকজন সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

—এই যে, এঁরাও এসে পড়েছেন। ভালোই হলো। একটা বিহিত হওয়া প্রয়োজন। সমাজের এতগুলো অভুক্ত ব্রাহ্মণ···

গাঙ্গুলীবাড়ির কয়েকজন—কি ব্যাপার?

দর্পনারায়ণ—আমি বলচি। ব্রাহ্মণ-সন্তান, সনাতন হিন্দুধর্মপালন ও রক্ষণ আমাদের অবশ্য কর্তব্য। বিধান, দায়ভাগ—আমাদেরই হাতে। বলো না হে আচায্যি?

শ্রীধর—অবশ্য-অবশ্য। যথা কথা।

দর্প—এ্যাই। তার ওপর সমাজের দায়-দায়িত্বও আমাদের স্কন্ধে, তার আপনারা হচ্ছেন প্রধান সমাজপতি।

শ্রীধর—যথার্থ! [মাথা দোলাইতে লাগিলেন]

দর্প—[সোৎসাহে]—এতো বড়ো সমারোহ কাজে আপনারই বাড়িতে ও আমরা জেনে শুনে…। তুমি কি বলো হে বামাচরণ?

বামাচরণ—অাঁজ্ঞে…আমি আবার…। তা…হেঁ…হেঁ…হেঁ তা বটেই তো! [গুম্ফ কণ্ডুয়ন করিতে লাগিলেন]

বিপ্রদাস—আহা, খুলেই বলোনা—কি বলতে চাও।

দর্প—আঁজ্ঞে হ্যাঁ, আমি সেই কথাই বলবো, মানে আমাদের সকলেরই কথা,—আজকের এই বৈঠকে, মানে, ন্যাড়া যদি স্বহস্তে পরিবেশন করে, তাহলে কেউই আমরা এখানে জলস্পর্শ করবো না…

শ্রীধর—ব্যাপারটা মানে, ন্যাড়া তো দিনরাত ওই বিলেতফের্‌তা শিব বাঁড়ুয্যের বাড়িতে থাকে বল্লেই তো চলে…তার ওপর সেখানে অখাদ্য কুখাদ্য, মানে মুর্গিটা আশটা খেতেও ওর…

সকলে—ইস্! রামচন্দর…

[জিহ্বাগ্রে নিষ্ঠীবন আনিবার প্রচেষ্টায় সকলের একত্রে শুষ্ক কণ্ঠের পরিত্রাহি মহড়া—]

দর্প—আরে, আমিওতো মানে সেবার ব্যাপারটা নিজ চোখে নিরীক্ষণ করলুম গো। তার ওপর কান্তি পণ্ডিতের পরিবারের সৎকারে ও ন্যাড়া চলে গেলো কারো নিষেধ না শুনে—

বিপ্রদাস—হুঁ! সবই তো বুঝ্‌লেম দর্প। কিন্তু ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখেচো?

দর্প—অাঁজ্ঞে…

গাঙ্গুলীবাড়ির জনৈক ব্যক্তি—বিপ্রদা ন্যাড়াকে কতদুর ভালবাসে তা জানেন কি ভট্‌চায্যি মশায়? ‘ফি’-র টাকা যোগাড় করতে না পেরে যখন সেবারে ন্যাড়ার এন্ট্র্যান্স পরীক্ষা বন্ধ হয়ে

যাবার যোগাড়, তখন গুলজারীলালের কাছ থেকে সুদ করে টাকা ধার নিয়ে বিপ্রদা-ই সেবারে ওকে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। সন্তানের তুল্য সেই আপন ভাগ্নেকে উনি কেমন ক'রে এখন…

দর্প—তা অবশ্য জানি, তবে সমাজের শৃঙ্খলা যদি ওঁর মতো একজন সমাজপতি…মানে, আচার্য এখন বলো না, চুপ করে রইলে কেন?

শ্রীধর—হ্যাঁ…। শাস্ত্রে বলে—বিষধর সর্প যদি ডান হাতেও কামড়ায় তবুও প্রাণের দায়ে নিষ্ঠুরভাবে ছেঁটে ফেলতে হবে সেই ডান হাতটিকে—হেঁ হেঁ হেঁ।

দর্প—বড় কঠোর বিধি!…

বিপ্রদাস—আপনাদের ইঙ্গিত আমি বুঝেছি। তবে ওকেওতো জানি। বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হওয়াটা ওর পক্ষেও নতুন নয়। এখন বয়েস হয়েছে…শিক্ষাও…

দর্প—না না · গাঙ্গুলীমশাই! সমাজের জন্যে আত্মীয়কে বর্জন করবেনই বা কেন? হাজার হোক—পর নয়, আপন ভাগ্নে। তবে, মায়া-বন্ধন, সমাজ-শৃঙ্খলা—দুটোয় তফাৎ ঢের।

শ্রীধর - আমরা না হয় এখান থেকে ··

বিপ্রদাস—না না, আপনারা বসুন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের মান আমাকে প্রাণ দিয়েও রাখতে হবে দরকার হলে। তাই হোক্—এই নিষ্ঠুর সমাজের অধিপতি হয়ে আমি নিজে কোন খারাপ দৃষ্টান্ত রাখবো না—ডান হাতই আমি বর্জন করবো। ওরে, কে আছিস…একবার ন্যাড়াকে…

বামাচরণ—আমিই যাচ্ছি।

[প্রস্থান]

শরৎচন্দ্র—[হন্তদন্তভাবে প্রবেশ করিয়া] আমায় ডেকেছেন মামা ?

বিপ্রদাস—হুঁ ! তোমায়·· তোমায়

শরৎচন্দ্র—[প্রশ্নের মাঝে]—সমস্তই তৈরী হয়ে গ্যাছে মামা। ওদিকের বারান্দায় জিনিষপত্র বোঝাই ছিলো—সমস্ত সরিয়ে ফেলে আসন পাতা-টাতা কর্‌তে একটু দেরি হয়ে গেলো [নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের প্রতি] এতো বেলা পর্যন্ত আপনারা অভুক্ত··· কত কষ্ট পেলেন না জানি ! আপনারা আসুন, আমি এখনি আপনাদের পরিবেশন করছি।

[কাঁধ হইতে গামছাটি লইয়া তাড়াতাড়ি কোমরে বাঁধিতে লাগিলেন—]

বিপ্রদাস—না।

[শরৎচন্দ্র বিস্মিতভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মাঝ থেকে হঠাৎ দুটি ছোট ছেলেমেয়ে কাঁদিয়া উঠিল।]

দুটি ছোট ছেলেমেয়ে—বড়ো খিদে পেয়েচে যে বাবা। কখন খাবো ?

[পিতা শ্যামাদাস চক্রবর্তী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা তাঁর। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হইলেও প্রথম দর্শনে ৬০।৭০ বছর বলিয়া মনে করিতে কাহারও ভ্রম হয় না। চুলে ভীষণভাবে পাক ধরিয়াছে। পরিধানে ছিন্ন বাস, পায়ে জীর্ণ বিবর্ণ চটি। দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট।]

শ্যামাদাস—এই যে মা, এখুনি হবে। একটু থাম না।

শরৎ—এই যে খোকা, এখুনি বন্দোবস্ত হ'চ্চে···

বিপ্রদাস—নাঃ।

শরৎ—কি বলছেন মামা !

বিপ্রদাস—তুমি আজ এঁদের খাবার পরিবেশন করতে পাবে না···

শরৎ—আঁজ্ঞে···মানে···

শ্যামাদাস—আহা, গাঙ্গুলীমশাই! তা হোক্ না ··হাজার হোক ব্রাহ্মণ-সন্তান তো! একটু মা গঙ্গার জল মাথায় ছিটিয়ে দিলেও তো শুদ্ধি।

দর্প—আঃ! থামো দিকিনি তুমি? পেট ছিঁড়ে পড়চে না? বলি, কতদিন জোটেনি?

শ্যামা—আপনি ঠিক ধরেছেন ভট্চাযি্য মশাই। আমরা বড়ো দীনদুঃখী, সব দিন তো জোটে না। তবে, সেজন্যে এখন বলচি না... সে সব আমাদের নিত্যকার ব্যাপার, গা সওয়া হয়ে গ্যাছে।

দর্প—তবে হঠাৎ মাঝে থেকে ফোড়ন দিতে উঠলে কেন? হেঁ—বলে, আদা-ব্যাপারীর আবার সমুদ্রের জল মাপার সাধ!

শ্যামা—আঁজ্ঞে, ন্যাড়া-বাবার তো কোন দোষ নেই! মানে গঙ্গাজলের মতো চরিত্তির। রোগে-শোকে-সেবায়, বিয়ে-পূজো-আচ্ছায়, এমন কি শ্মশানে-সৎকারে ন্যাড়াবাবা না থাকলে কি আর পাড়ার গরীব দুঃখী বাঁচতো! তাই বলছিলুম বলি—এই বয়েসে এমন প্রাণ···

দর্প—ঢের হয়েছে! এখন খসে পড়ো না বাপু!

শ্রীধর—ধান ভানতে শিবের গাজন··

শ্যামা—আচ্ছা, আমরাই খসে পড়ছি। আয় মা পিণ্টু ··

ছেলেমেয়ে—সে কি বাবা! আমাদের খেতে দেবে না! আর যে চলতে পারি না বাবা!

[অবসন্নভাবে পুনরায় বসিয়া পড়িল]

শরৎচন্দ্র—না—না, আপনি যাবেন না চক্কোত্তিমশাই! খোকা-খুকু তোমরা বসো। আমিই যাচ্ছি তা'হলে।···তবে, ব্যাপারটা

ঠিক বুঝতে পারলাম না মামা·· এতদিন ধরে এ ভারটা আমার ওপরেই তো ছিলো !

বিপ্রদাস—তারা···তারা। আর যে সহ্য করতে পারি না মা !

দর্প—আহা-হা, ব্যাপারটা বুঝচো না কেন ? তুমি আমাদের সমাজে পতিত। তুমি ছুঁলে বা পরিবেশন করলে এতগুলি নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ কেউই আজ এ বাড়িতে জলটি পর্যন্ত স্পর্শ করবেন না।

শরৎচন্দ্র—[বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে চাহিয়া] ওঃ! আমি অস্পৃশ্য···সমাজে পতিত! কুকুরে বিষ্ঠা খায়···কত জাতের পাতের উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেড়ায় বেড়াল! কই তাদের ছুঁলে তো জাত যায় না কারো! খেতে খেতে বেড়ালকে ছুঁলে তো খাওয়া বন্ধ করতে দেখা যায় না! মানুষের সমাজে জন্তুর সেই সামান্য অধিকারটুকুও পাবে না মানুষ!··কুকুর-বেড়ালেরও অধম আমি? বেশ, আমি আপনাদের কাছ থেকে অস্পৃশ্য হয়েই বিদায় নিচ্ছি ভটচায্যিমশাই। আমি চলেই যাচ্চি।···

[প্রস্থান]

বিপ্রদাস—তারা···তারা···তারা।

শ্যামাদাস—উঃ! ভট্‌চায্যিমশাই, আপনি মানুষ না কশাই !

দর্প—চোপ্‌ রও! জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলবো তোমার।

শ্যামাদাস—আয় মা পিণ্টু !···আয় নণ্টে। চামারের হাতের চেয়ে শকুনির মুখে পড়া ঢের ভালো, তারা খেয়ে বাঁচবে তবু।

[ক্ষুধার্ত ভীত সন্তানদের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে শ্যামাদাস চক্রবর্তী বাহির হইয়া গেলেন।]

দর্প—[ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে]—তবেরে···

[সেইপথে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন—

বিপ্রদাস—আ-হা···দর্প !···তারা ! তারা।

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে সেই দিকে ছুটিয়া গেলেন।

[সভাস্থল থম থম্ করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে বিপ্রদাস সেখানে ফিরিয়া আসিয়া ধরা অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন—]

—তারা···তারা···তারা, কৈবল্যদায়িনী মা ! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক তবে ! [নিমন্ত্রিতগণের প্রতি]—আপনারা··· আপনারা আর একটু অপেক্ষা করুন ! ন্যাড়া চলে গেছে। আর কোন ভয় নেই ! আমি এখুনি ভোজনের ব্যবস্থা করছি।

[ধীর পদক্ষেপে ভিতরের দিকে গেলেন। সময় অতিক্রান্ত হইতেছিল।

বামাচরণ—কাজটা যেন কেমনধারা হলো !

শ্রীধর—খামোকা শ্যামাদাসটা জুটে···এদিকে দর্পনারাণ আবার রাগের মাথায় কোথায় কি কল্লে কে জানে !

বামাচরণ—ফিরবেই এখুনি, ভটচায্যিকে তো জানি ! তবে, যাই বলো না কেন বাপু, ন্যাড়াকে এইভাবে বর্জন করাটা আমার যেন একটু কেমন লাগছে।

শ্রীধর—মানে !

বামাচরণ আবার মানে ? আর মানে-র দরকার নেই আচাযি্যদা। শেষে কিনা একটা খুনোখুনি হবে এই ভরা দুপুরে। তবে হ্যাঁ, একখানি ঝানু শকুনি মামার চাল বটে ! মাথা বটে দর্প-নারাণের ! দর্পনারায়ণ তো নয়, যেন দক্ষ নাড়াবন। ওঁর অন্তে ওঁর মাথার খুলিটা খুলে নিয়ে বেশ ভাল করে বাঁধিয়ে রেখে দিতে হবে ! হেঁ···হেঁ···হেঁ ! ঘোর অমাবস্যার রাতে ওই খুলিতে করে কিঞ্চিৎ কারণ পান করলে নিশ্চয়ই সর্বার্থসিদ্ধি।

শ্রীধর—[বজ্রকণ্ঠে]—বামাচরণ···

বামাচরণ—[সে ডাকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উচ্চহাস্য করিতে করিতে] একেবারে চতুর্বর্গের ফল ফলবে, মাইরি বলছি আচায্যিদা! আ-হা-হা-হা!

[সেই হাস্যে যেন সভাস্থল কাঁপিয়া উঠিল। সকলে কেমন এক অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। পর্দা নামিল মঞ্চে।]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

১৯০২ খৃষ্টাব্দ। মজঃফরপুর।

ধর্মশালার একাংশ। গভীর রাত্রি। নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে দু' একটি পাখীর কর্কশ চীৎকার দূর হইতে ভাসিয়া আসিয়া রাত্রির নীরবতা ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। ধর্মশালার অপরিচ্ছন্ন মেজেতে কয়েকটি লোক শয়ন করিয়া ঘন ঘন নাক ডাকাইতেছিল। সাধারণ বেশভূষা তাদের। আশে-পাশে কয়েকটি পোঁটলা-পুঁটলি ছড়ান।

হঠাৎ স্তিমিত হইয়া গেল মঞ্চের পাদপ্রদীপ। রিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠিল কার করুণ কণ্ঠ। ক্ষীণ আলোকে দেখা গেল—সন্ন্যাসী-বেশে শরৎচন্দ্র ধর্মশালার একদিকে ধূলিমলিন সামান্য এক শয্যায় বসিয়া মুক্ত আকাশের দিকে মুখ করিয়া আপন মনে গান গাহিতেছেন। হঠাৎ একজন লোক ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিয়া চোখ রগড়াইয়া

নিয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল কিছুক্ষণ, তারপর পুনরায় শুইয়া পড়িয়া সেই সুরের আমেজে খানিকক্ষণ মুখ হাত মাথা দোলাইতে দোলাইতে ঘুমাইয়া পড়িল। একটু পরে নিশানাথবাবু সেখানে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে শরৎচন্দ্রের গান শুনিতে লাগিলেন। শরৎচন্দ্রের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিলো না, তিনি গাহিতেছিলেন—

॥ মিশ্রভৈরবী—(দ্বাদশী) ॥

॥ তাল - দাদরা ॥

ঘুমের ঘোমটা তোলে চুপে চুপে প্রভাতী তরুণ বায়
দখিন কারার খুলে গেছে দ্বার পূবালী আলোর ঘায়।
লাগলো পরশ আবেশ ভরে
ফুটলো যে ফুল বনান্তরে…
রক্তাধরে জমলো যে তান—আকুল প্রতীক্ষায়!
ওদের সেথায় চাদনী রাতে প্রাণ বিনিময় ছলা,
বুভুক্ষুদের কুল কামনায় কাঁপছে শকুন্তলা!
ধূলি-ধূসর ধরার কুলায়
লক্ষ জীবন হেথায় লুটায়—
ব্যর্থ প্রেমের শিখা ওঠে—অস্ত-রবির রাঙা চিতায়।

[গান শেষ করিলেন শরৎচন্দ্র। তাঁহার দু' চোখ অশ্রুভারে টলমল্ করিতেছিল। নিশানাথ সেইদিকে আগাইয়া গেলেন।]

নিশানাথ—নমস্কার।

শরৎচন্দ্র—(চমকিয়া)—কে! ··কোন্··

নিশানাথ—আমি নিশানাথ। সেই সেদিন পথে এক চমক দেখা হয়েছিলো আপনার সঙ্গে ··

শরৎচন্দ্র—ও ! নমস্তে···

নিশানাথ—মাপ করবেন, আমি বাঙালী, বাংলায় কথা বললে ভালো লাগবে আমার। আর আপনিও তো বাঙালী, যদিও আপনি হিন্দীতে ছাড়া কথা বলছেন না আমার সঙ্গে।

শরৎচন্দ্র—[ম্লান হাসিয়া]—লেকিন্ ম্যায় তো বিহারী হুঁ।

নিশানাথ—বিহারী কিনা তা আপনিই জানেন, তবে এমন বাংলা গান, বাংলা শব্দের এমন নিখুঁত উচ্চারণ আর সেই সঙ্গে এমন দরদঢালা কণ্ঠের অপূর্ব সম্মেলন—এ যে একমাত্র বাঙালীরই নিজস্ব, এ আমি হলপ করে বল্‌তে পারি। বাংলাগানে এমন বাদী সম্বাদী মীড় ঠাট···

শরৎচন্দ্র—[সবিস্ময়ে]—আপনিও গান করেন বুঝি?

নিশানাথ—[হাসিয়া]—বিয়ে না করলেও বরযাত্রীর অভিজ্ঞতা তো থাকতে পারে সন্ন্যাসীঠাকুর ! গান শোনার সখও তো আছে —পাঁচটা আসরে ক্লাবে রাতও কাটিয়েচি। তার ওপর, কদিনই এম্নি সময়ে এই ধর্মশালার পাশ দিয়ে যাবার সময়ে শুনচি আপনার গান···। সত্যি, অপূর্ব আপনার কণ্ঠ !

[শরৎচন্দ্র নতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন]

নিশানাথ—সুর ও কণ্ঠের এই চমৎকার মণিকাঞ্চনযোগ আমি কখনো শুনিনি ! আজ আর থাকতে পারলাম না, পরিচয় করতে এলাম আপনার সঙ্গে।

শরৎচন্দ্র—কিন্তু আমার তো পরিচয় দেওয়ার মতো কোনো সম্বলই নেই ভাই। আছে শুধু পৈত্রিক আর উত্তরাধিকারীসূত্রে পাওয়া সামান্য নামটা—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নিশানাথ—ও, আপনি শরৎচন্দ্র !...কি সৌভাগ্য···এত কাছে আপনাকে··

শরৎচন্দ্র—এঁ্যা, কে কি বলেচে আমার সম্বন্ধে…? প্রমথ কি…

নিশানাথ—না, কেউ আমাকে কোনো খবরই দেয়নি আপনার সম্বন্ধে… এমন কি আপনার নামটিও বলেনি—। শুধু এই নবীন সন্ন্যাসী সম্বন্ধে এখানে একটা কৌতুহল জেগেছে সবাইয়ের মধ্যে।

শরৎচন্দ্র—তবে?

নিশানাথ—আমার দাদার মুখে শুনেচি যে আপনি একজন উদীয়মান লেখক। আমার বৌদিও একটু আধটু লেখেন—তিনি আপনার লেখার প্রশংসা করে দাদাকে শুনিয়েছিলেন, তবে আপনি যে ভাগলপুর ছেড়ে এখানে এই বেদনাময় নিরুদ্দেশ জীবন যাপন করচেন তা তাঁরা কেউই জানেন না, আর আপনাকে তাঁরা দেখেনও নি, শুধু নাম শুনেছেন মাত্র।

শরৎচন্দ্র—কিন্তু, আমি তো কাউকে চিনিনে, কি বা লিখেচি যে…

নিশানাথ—আমার দাদার নাম শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এখানেই থাকেন তিনি। আমার বৌদি অনুরূপা দেবী তখন ভাগলপুরে ছিলেন। ওঁর সমবয়সী ওঁরই এক জ্ঞাতি খুড়ো—অরুণদেব নাম—আপনি নিশ্চয়ই চেনেন তাঁকে?

শরৎচন্দ্র—হ্যাঁ, হ্যাঁ—অরুণ আমার বিশিষ্ট বন্ধু।

নিশানাথ—তাঁর কাছে আপনার লেখার পাণ্ডুলিপি ছিলো—তার মধ্যে থেকে বৌদি আপনার রচনা পড়েছে। "অনুপমার প্রেম, বামুনঠাকুর, কোরেল" সমস্ত রচনাই বৌদি পড়ে নিয়েচে, এমন কি আপনাদের হাতে লেখা পত্রিকা 'ছায়া'ও ওঁর নজরে এড়ায় নি।

শরৎচন্দ্র—ও সব কি আর লেখা? দেখো দিকিনি—অরুণটা কি ছেলেমানুষি করলে।

নিশানাথ—কিন্তু আপনাকে আমার একটা অনুরোধ রাখতেই হবে শরৎদা। আজ থেকে আপনি আমার দাদা হলেন, সেই সুবাদেও আমি এটা দাবী করচি।

শরৎচন্দ্র—তা না হয় হলো, কিন্তু কি এমন অনুরোধ ভাই ?

নিশানাথ—আমি জানি, এখানে আপনার খুবই কষ্ট হচ্ছে থাকা খাওয়ার, অবশ্য আপনার এই বর্তমান জীবন যাপন সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তুলে আপনার মনে আমি ব্যথা দিতে চাইব না—শুধু এইটুকু অনুরোধ, যতদিন এই মজঃফরপুরে থাকবেন আপনি ততদিন আপনাকে আমাদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে। [শরৎচন্দ্র চুপ করিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ] কথা দিন দাদা।
[শরৎচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিলেন।]

শরৎচন্দ্র—সে কি করে হবে ভাই ? তোমার দাদা বৌদি কাউকেই তো·· আর তা' ছাড়া আমার পক্ষে এই ধর্মশালাই ভালো। কোনো ঝামেলা নেই—কত রকম মানুষকে দেখি···

নিশানাথ—তা দেখুন, কিন্তু তবুও আপনাকে যেতে হবে। আমাব দাদা বৌদি খুবই আনন্দিত হবেন এতে। আপনাকে নিয়ে এরই মধ্যে অনেক আলোচনা করিচি আমরা। শুধু আমি নয়—তাঁরাও ভীষণ গান ভালবাসেন। আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে রাজী করাবাব ভাব ছিলো আমাব ওপরে—এর ওপর এখন তাঁরা জানবেন যে, আপনি শুধু তাঁদের কাছে নবীন সন্ন্যাসী নন, তাঁদেব পবিচিত লেখকও বটেন।

শরৎচন্দ্র - না· না·· ওসব লেখক-টেখক আমি নই·· ও কবে কি ছেলে-খেলা করেছিলাম ছেলেবয়েসে। সে আমি ছেড়েও দিয়েচি···!

নিশানাথ—[হাসিয়া]—তা বেশ করেছেন, ল্যাঠা চুকে গিয়েচে। কিন্তু আপনাকে যেতেই হবে শরৎদা। আপনার গান থেকে বঞ্চিত

করবেন না আমাদের। গানের সব কিছু সরঞ্জাম আছে আমাদের বাড়িতে।

শরৎচন্দ্র—বটে! খুব জোর মজলিস চলে বুঝি?

নিশানাথ—ভালো গায়ক পাওয়া গেলে গানবাজনার আসরটা বেশ জমে ওঠে। যেদিন তেমন না জোটে—সেদিন আমরাই রাজ্য চালাই আর কি!

শরৎচন্দ্র—বেশ তো, শুনতে যাবো একদিন তা হলে।

নিশানাথ—বারে, আবার ওইসব কথা। একদিন যাবো মানে! আপনাকে সেথায় আসন নিতে হবে দাদা। ও সব আমি শুনবো না।

শরৎচন্দ্র—না ছাড়লে আর কি করবো,- যেতেই হবে তা হলে। রীতের দোষে মরেচি যখন। কিন্তু কারা আসেন মাঝে মাঝে?

নিশানাথ—আসেন অনেকে। তবে, মাঝে মাঝে আসেন মহাদেব সাহু, মজঃফরপুরের একজন জমিদার।

শরৎচন্দ্র—জমিদার! মহাদেব সাহু!

নিশানাথ—হ্যাঁ। খুব সমজদার উনি সংগীতের। নিজেও গানবাজনা জানেন। বাড়িতেও গায়ক বাদক বাঈজীর ব্যবস্থা আছে ওঁর।

শরৎচন্দ্র—হুঁ! গায়ক ও বাদক! সংগীতরসিক! বাঃ—বেশ তো তাহলে রাজাসাহেব।

নিশানাথ—আপনার দেওয়া এই নতুন উপাধিটাও তো বেশ। শুনিয়ে দেবো আপনার রাজাসাহেবকে। কিন্তু, তাঁকে চেনেন নাকি শরৎদা?

শরৎচন্দ্র—না, তবে চেনার আশা রইলো এবার।

[দু'জনে দু'জনের দিকে চাহিলেন। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

দু'মাস পরে।

মজঃফরপুর। রাজা মহাদেব সাহুর প্রমোদকক্ষ। সময়—রাত্রি। কক্ষ জুড়িয়া সবুজ মখমলের গালিচা পাতা। চারিদিকে সারিবদ্ধ ভেলভেটের তাকিয়া। গালিচার মধ্যস্থলে মীনা-করা রূপার একখানি প্রকাণ্ড পরাত। পরাতের মধ্যে সুগন্ধি পানের খিলি, জরদা, মসলা। কক্ষের এক কোণে মেহগিনি কাঠের একটি তেপায়া, তেপায়ার উপর কারুকার্যখচিত একটি বড় ফুলদানি। ফুলদানিতে কয়েকটি কেয়াফুল দাঁড় করান। আসরের মাঝে কয়েকটি আতর-দান। উপরে পঁচিশ বাতি ঝাড় লণ্ঠনে আলোর জৌলুষ। কক্ষেব দরজা-জানালায় মূল্যবান পর্দা হাওয়ায় কাঁপিতেছে।

সংগীতের বৈঠক। সেতাব সাবেঙ্গী তানপুরা বেহালা এস্রাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে সুরারোপের মহড়া। একটু পরে শরৎচন্দ্র প্রবেশ করিলেন। রাজা মহাদেব সাহু সংগীতবসিকদের সঙ্গে তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া বসিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত বাঈজী সুললিত কণ্ঠে গান ধরিল। তবলা সঙ্গত শুরু কবিলেন শরৎচন্দ্র।

সংগীতের মাঝে সহসা বাইজীব সঙ্গে চোখোচোখি হইল শরৎচন্দ্রেব, মুহূর্তে তার মাঝে কি লক্ষ্য করিলেন তিনি। আনন্দের গতি তাঁর স্তিমিত হইয়া গেল। নতমুখে সঙ্গত করিতে লাগিলেন পুনরায়। তবলার ওপর আঙুলগুলো তাঁর তেমন লীলায়িত ছন্দে আর চলিতেছিল না। শরৎচন্দ্রের এই আকস্মিক পরিবর্তিত অবস্থা দেখিয়া অনেকেই বিস্মিতভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন। শুধু বাঈজীর রাঙা ঠোঁটে বাঁকা হাসির ঝিলিক দেখা দিল। বাঈজী গাহিতেছিল—

॥ ঠুংরী—পিলু-খাম্বাজ ॥

॥ তাল—আর্দ্ধা ॥

অবহুঁ পিয়া আএ ঘর—
মঝু অঞ্চল খুলি খুলি জাএ।
ঢুঁড়ত তুয়া লাগি সবহু দেশ
লোক-লাজ বিসরাউঁ—
ন জানহুঁ পিরীত কি অইসন রীত
কীয়ে অনুখন দুখ পাউঁ!
দিন ন গমাওয়ে অকেলী এহি
শাওন রাতিয়া নিদ ন আএ ॥

শ্রোতৃবৃন্দ—[উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে]—সাবাস্! সাবাস্! চমৎকার!

মহাদেব সাহু—[কিছুক্ষণ পরে]—কিন্তু শরৎবাবু, আপনার হঠাৎ কি হলো বলুন তো? আপনার ছন্দশৈথিল্য তো কখনো দেখা যায় না। গানের শেষ দিকটায় আপনি যেন কেমন···

[শরৎচন্দ্রের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বাঈজী তাঁহার দিকে চাহিয়া তখনও কিন্তু মুচকি হাসিতেছিল, আর ঘাঘরার খুঁট দিয়া মাঝে মাঝে ক্লান্ত অঙ্গের স্বেদবিন্দু মুছিতেছিল।]

শরৎচন্দ্র—হুঁ!···মানে···না···আপনারা একটু বসুন, আমি···আমি একটু আসচি।

[প্রশ্নের সুযোগ না দিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন—

জনৈক ব্যক্তি—কি ব্যাপার রাজাসাহেব! বিকেলে শিকার থেকে ফেরার সময় ওঁকে তো খুব প্রফুল্ল দেখলাম···বললেন, আজকের জলসা খুব জমিয়ে দেবো দেখো...অথচ···

মহাদেব—হ্যাঁ, তাইতো ভাবচি। আজকের জলসায় নিশানাথবাবুও এলেন না।

জনৈক—কে নিশানাথবাবু?

মহাদেব—ওই যে শিখরনাথবাবুর ভাই·· দু' মাস অতিথি ছিলেন শরৎবাবু যাঁদের বাড়িতে যেখান থেকে এই অমূল্য রত্নটি পেলাম···

জনৈক—ও হ্যাঁ, হ্যাঁ···

[হন্তদন্তভাবে ভৃত্য রামলগনের প্রবেশ

রামলগন—রাজা সাব?

মহাদেব—কে? রামলগন? কি সংবাদ?

রামলগন—অব্ দিমাগ্ খারাপ করনেবালা এক বড়ী আর্জেন্টিয়া চিঠ্‌টি শরৎবাবুকে হাতমে আগয়া। উসে পঢ়্‌কর্ উনকা মাথা বিগড়্ গয়া, উয়ে আভী চলে যাতে হৈঁ!

মহাদেব—সে কিরে! কি বলছিস্ তুই রামলগন?

রামলগন—জী হাঁ, সাচমুচ কহতা হুঁ। এক বাবু ওহি চিঠ্‌টি দেকর্ চলা গিয়া আভী। শুনা কি—উন্‌কা পিতাজী মর্ গয়ে ভাগলপুরমে।

মহাদেব—কি সর্বনাশ!

[দ্রুত ভিতরের দিকে ছুটিয়া গেলেন। স্তম্ভিত সকলে তাঁহার অনুসরণ করিল। শুধু বাঈজী আর ভৃত্য রামলগন সেইখানে রহিল।]

রামলগন—মাইজী, আপ্‌কে কেয়া কাম্‌মে লাগুঁ?

বাঈজী—হ্যাঁ, শরৎবাবুর কাছে গিয়ে এখনি বলবে, যাবার সময় তিনি যেন একবার আমার সঙ্গে এইখানে দেখা করে যান। বলবে যে, মাইজী আপনাকে সেলাম দিয়েছেন। কেমন, পারবে তো বলতে?

রামলগন—জরুর। আভী ইয়ে সব উঠা কর্ মিন্নটভর্মে” হাম ওয়্হাঁ সব কুছ খবর ভেজ্ দু্ঁ।

বাঈজী—আচ্ছা।

[প্রস্থান। রামলগন তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া দ্রুত ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। একটি একটি করিয়া নিবিয়া গেল বাতি। একটু পরে আপন মনে কথা বলিতে বলিতে শরৎচন্দ্র প্রবেশ করিলেন। তাঁর বেশভূষা রুক্ষ · কথাবার্তা এলোমেলো। ধীরে ধীরে জ্বলিয়া উঠিল বাতি—মঞ্চের পাদপ্রদীপ।]

শরৎচন্দ্র—প্রতিশোধ চরম প্রতিশোধ সেধে গেলেন বাবা। সামান্য অভিমানে পালিয়ে এসেছিলাম বলে মরে গিয়ে তিনি···

[হঠাৎ বাঈজীর দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়িল। বাঈজী এরি মধ্যে বেশভূষা পরিবর্তন করিয়া লইয়াছে। পরণে বৈধব্যের সাজ বেশ পরিস্ফুট।]

শরৎ -[চমকিয়া]—কে! হঠাৎ এ বেশ কেন বাঈজী ?

বাঈজী—ও কথা থাক্! কিন্তু বাবা নেই ?·· কে···কে পাঠালে এ সংবাদ ?

শরৎ -নিশানাথ।

বাঈজী—অভিমানের কথা কি শুনছিলাম···

শরৎ—হ্যাঁ, মা তখন মারা গিয়েছেন—বাবা আমাদের নিয়ে খঞ্জরপুরে বাসা ভাড়া করেছেন। সংসারে চলচে নিদারুণ দুঃখ কষ্ট। দেশের বাড়িখানা তখন হস্তান্তরিত হয়ে গেছে। সেই নিদারুণ অবস্থার দিনে একদিন কথায় কথায় সামান্য কারণে বাবার সঙ্গে আমার হলো মনান্তর! জীবনে যিনি আমার শত

অন্যায়েও কোনোদিন কোনো কথা বলেন নি, সেদিন সেই তিনি আমায় ভয়ানক তিরস্কার করলেন···

বাঈজী—তাতেই সন্ন্যাস নিতে হলো ?

শরৎ—জীবনে অনেকবার সন্ন্যাসী হয়ে পালিয়ে গেছি বাঈজী, এ আর আমার কাছে নতুন নয়।

বাঈজী—ও, তা সেই ছন্নছাড়া জীবনের ইতিহাস বোধ হয় কিছু কিছু আমারও জানা আছে।

শরৎ—এ্যাঁ! তুমি···তুমি···

বাঈজী—[হাসিয়া]—হ্যাঁ, বাঈজীরাও অনেকের অনেক কিছুই খবর রাখে সন্ন্যাসী ঠাকুর। বড় আশ্চর্য লাগছে আমার কথাগুলো, না ? কিন্তু ভালো করে একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো দিকি—চিনতে পারো কিনা আমাকে।

শরৎ—এ্যাঁ!···তবে কি তুমি···

বাঈজী—যা ভাবচো হয়তো তাই···হয়তো বা তাও নই আমি। কিন্তু পূর্ব পরিচয় যদি আমার না-ও থাকে, তাহলে কি ঘৃণায় মুখ ফেরাবে তুমি ? আমি পতিতা বলে কি···

শরৎ—না, কেউ পতিতা নয়—কাউকে আমি কোনদিন ঘৃণাও করিনি..। কিন্তু তবুও আমি তোমাকে এখানে আশা করিনি। বোধ হয় তাই তোমাকে এখানে দেখে প্রথম থেকেই চেনা চেনা লাগছিলো, অথচ কিছুতেই স্মরণ করতে পারছিলাম না। গানের সময় কেমন উন্মনা হয়ে গিয়েছিলাম···

বাঈজী—আমি সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। তাই তো যখন সকলে তোমার দিকে প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে চাইছিলো···তখন ভারী কৌতুক লাগছিলো আমার।

শরৎ—বটে! তোমার ছেলেমানুষি তো একটুও কমেনি দেখছি?

আমাকে বিব্রত করে মজা লুটতে এখনো তো তোমার উৎসাহ একটুও কমলো না !

বাঈজী—পৃথিবীর ওপর দিয়ে কত ঝড়-ঝাপ্টা বয়ে গেলো, মাটির মানুষের জীবনে কত পরিবর্তন এলো, কিন্তু এই সন্নেসি-সন্নেসি খেলাটাও তো তোমার একটুও কমলো না ?

শরৎ—[ম্লান হাসিয়া] তাই বটে ..হ্যাঁ, তাই বটে ! ধী...

বাঈজী—উঁ ।

শরৎ—[দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কিছুক্ষণ পরে] শুনেছিলাম, তোমার বিয়ে হয়েছিলো ?

বাঈজী—হ্যাঁ। কিন্তু তোমাদের হাতে গড়া সমাজে বেশী দিন তা সহ্য হলো না। এমন কি, আমার স্বামীরূপী বেচারা জীবটি মারা যাবার পরেও কম জ্বালায় আমাকে জ্বলতে হয়নি সেই সমাজেরই নিষ্ঠুর নাগপাশে। যাক্ সে কথা। তাসের খেলাঘর তো ভেঙেই গেছে ! এখন এটাই আমার আসল রূপ, চিরন্তন সাজ ।

শরৎ—কি ব'লচো তুমি !

বাঈজী—হ্যাঁ। এই সাজই আমার সত্য পরিচয়। দুঃখ ক'রো না। কিন্তু সে বয়সে এ বেশের বিপদটাও তো বড় কম ছিলো না...

শরৎ—[ঝাঁঝের সঙ্গে] তাই বুঝি আরো জমকালো সাজে সেজেছিলে তারপর থেকে ?

বাঈজী—হ্যাঁ। কিন্তু বাঈজীর পোষাক আমি কি জন্যে নিয়েছিলাম জানো তুমি ?

শরৎ—কি জন্যে ?

বাঈজী—তোমারই জন্যে ।

শরৎ—আমারই জন্যে ! মানে ?

বাঈজী—হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকেই তো তোমাকে চিনি। যতো দুরন্তপনা, যতোই বীরত্বের বড়াই করো না কেন—জানিতো কত অসহায়, কত দুর্বল তুমি।

শরৎ—[জেদীর মতো] কখ্খনো না।

বাঈজী—থাক্। আর বাহাদুরি করতে হবে না।

শরৎ—কখনো না!

বাঈজী—বেশ, তাই-ই যদি বা হয়, তো সেই খেয়ালীপনার বিষম বোঝা বইবার লোকও যে খুব কম আছে তোমার—তা-ও জানি।

শরৎ—[দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া] বিলাসীও এইরকম ছিলো। পৃথিবীতে তোমরা আছ বলেই হতভাগ্য পুরুষের দল এখনো...

বাঈজী—এটা ভুলতেও তোমাদের বেশী দেরি লাগে না...

শরৎ—রাগ করো না বাঈজী। জানোই তো, আমি একটি মূর্তিমান ছন্নছাড়া।

বাঈজী—হুঁ। এই ছন্নছাড়াটির খোঁজেই যে দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু কেউ দিতে পারলো না কোনো ঠিকানা। নিরুপায় হয়ে নিতে হলো এই পথ। শিখতে লাগলাম গান, নাচ। নতুন বাঈজীর রূপে গুণে কণ্ঠে দিনে দিনে মাতাল হয়ে উঠলো লক্ষ্ণৌর আবহাওয়া। খ্যাতি হলো দিগন্তবিস্তৃত। মনে আশা জাগলো—ভাবলাম, নিশ্চয়ই ধরবো এবার তোমাকে। যতই সন্ন্যাসী হতে যাওনা কেন ন্যাড়াদা, তোমার সন্ন্যাসের পীঠভূমি যে আমি জানি।

শরৎ—[বহুপরিচিত কণ্ঠের প্রিয় নামটি শুনিয়া চমকিয়া] এ্যাঁ! এ কি... কি...বল্‌ছিস্ তুই ধী..! না...না...চল্‌লাম। চল্‌লাম আমি বাঈজী...

বাঈজী—[পথ আগলাইয়া]—দাঁড়াও, যেতে আমি দেবো না। অনেক ঘুরে ঘুরে তোমার সন্ধান পেয়েছি। তোমার উদাসী মনের পরিচয় আমার অজানা নেই। সংসারের যেটুকু বা বাঁধন ছিলো তাও যখন তোমার নিষ্ঠুরভাবে ছিঁড়ে গেলো, তখন আমি জানি—তোমায় এবার ছাড়লে আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

শরৎ—কিন্তু, আমাকে যেতেই হবে বাঈজী। আমার অবস্থা তো শুনলে। বাপ-মা হারানো নিরুপায় ভাইবোন,—কত অসহায় হয়ে এখন কাঁদছে তারা! কার মুখ চেয়ে তারা সান্ত্বনা পাবে!···কে দেবে আশ্বাস? কোথায় সাহস?

বাঈজী—[খানিকক্ষণ ভাবিয়া]—বেশ, কথা দাও, পরে আসবে। তোমার জন্যে আমি লক্ষ্ণৌতে আলাদা বাড়ি করচি। কালই এখান থেকে চলে যাবো আমি। বলো, তুমি সেখানে ফিরে যাবে।

শরৎ—কথা ত দিতে পারবো না। হয়তো জীবনের সংগ্রামে এ বিশাল ভারতের কোথাও ঠাঁই হবে না···হয়তো ছিন্নভিন্ন হয়ে কোথায় কোন্ মগের মুল্লুকে তলিয়ে যাবো। কথা কি দেওয়া যায় বাঈজী?

বাঈজী—না। এইভাবে তোমাকে তিলে তিলে নিঃশেষ হতে কিছুতেই আমি দেবো না। প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিতেই হবে।

শরৎ—[ম্লান হাসিয়া]—প্রতিশ্রুতি! কি তার দাম আছে এ দুনিয়ায়! কৈশোরে কত স্বপ্নই তো আমাদের জীবনে এসে দানা বেঁধেছিলো। কিন্তু, কোথায় রইলো সেই কোমল রচনা! কালের দমকা হাওয়ায় কে কোথায় কি ভাবেই তো ছিটকিয়ে গেলাম বাস্তবের রুক্ষ প্রান্তরে! সেদিনের বিদায়ের ক্ষণে বেজেছিলো মল্লার, আজকের এই বেহাগের জীবন আশাবরীর

কান্নাতেই ভরতে দাও বাঈজী। [বাঈজী নতমুখে নীরব]—মাটির দেশের এই তো নিয়ম। কিন্তু, রাত যে হয়ে গেলো, এবার আমায় বিদায় দাও লক্ষ্মীটি।

বাঈজী—এই রাত্রে কেমন করে যাবে তুমি ভাগলপুরে!

শরৎ—আঁধারচারীর তো ভাবনা চলে না। [অগ্রসর হইতে গেলেন]

বাঈজী—[শরৎচন্দ্রের দুটি হাত ধরিয়া, অশ্রুসজল কণ্ঠে]—এই দুর্বিষহ বোঝা কি চিরকাল এম্নি করেই বয়ে বেড়াবো আমি! নিষ্ঠুর, কোনোদিনই কি তুমি আমার দিকে ফিরেও চাইবে না! ..

[ভাঙিয়া পড়িল]

শরৎ—[দু'হাত ধরিয়া তুলিয়া] না চেয়ে কি পাবি আমি? তাইতো আজ তোমার কাছ থেকে বড় আশা নিয়েই চলেছি—যেখানেই থাকি না কেন, এই বেদনাবিধুর স্মৃতি আমার শয়নে-স্বপনে-জাগরণে নিত্য-নবীন প্রেরণা যোগাবে চলার পথে।

[দু'জনের যুগল চোখ কয়েক মুহূর্ত নীরব রহিল, মুখও মৌন। শরৎচন্দ্র ধীরে ধীরে হাত দুটি ছাড়িয়া দিলেন, তারপর মন্থর পদক্ষেপে চলিয়া গেলেন। বাঈজী স্থাণুর মতো দাঁড়াইয়া সেই পথের দিকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ছড়াইয়া দিল।]

[পর্দা নামিল মঞ্চে।]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ব্রহ্মদেশ।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ। রেঙ্গুন, বর্মীপল্লী। দূরে জাহাজ ঘাট। জেটির কিয়দংশ দেখা যাইতেছে।

উষাকাল। দূরে জাহাজ ছাড়িয়া যাওয়ার হুইসিল বাজিয়া উঠিল। জেটির দিক হইতে একদল লোক সম্মুখের পথ দিয়া চলিয়া গেল। ইরাবতীর তীরে দাঁড়াইয়া শরৎচন্দ্র উদাস দৃষ্টিতে প্রভাতী আকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন। পরণে তাঁর বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ। অকস্মাৎ নির্মল আকাশের এক প্রান্তে আগুনের লেলিহান শিখা দূর হইতে দেখা গেল। ঠিক এই সময়ে ভিন্ন দিক হইতে গিরীন্দ্রনাথ সরকার সেই পথে আসিতেছিলেন। ইনি রেঙ্গুনের খ্যাতনামা গভর্ণমেণ্ট কণ্ট্রাক্টর এবং শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুন প্রবাসের প্রথম বাঙালী বন্ধু।

গিরীন—আরে, শরৎদা যে! কবে ফিরলে তুমি উত্তর বর্মা থেকে? হঠাৎ এই বেশে এই সকালে ওদিক পানে একদৃষ্টে কি-ই বা দেখচো?…

শরৎচন্দ্র—[তাঁহার দিকে ফিরিয়া]—ও গিরীন! ফিরেচি কাল সন্ধ্যায়। কিন্তু ওদিকের আকাশটা কেমন লাল হয়ে উঠেছে দেখেচো ··আকাশের একটা কোণ পুড়ে ঝল্‌সিয়ে উঠছে যেন আগুনের হল্কায়!

গিরীন—[সবিস্ময়ে]--তাইতো · তাইতো! দূরে শ্মশানে কোনো শবদেহের শেষকৃত্য চলচে বোধ হয়…চিতার আগুন…

শরৎচন্দ্র—হাঁ। আমিও তাই অনুমান করেছিলাম। তিন বছর আগে ভাগলপুরের জাহ্নবীকূলে এম্নি করে জ্বলেছিলো বাবার শেষ চিতাবহ্নি! কি দৃপ্ত তেজোপুঞ্জ তার। বেশীক্ষণ চাইতে পারিনি সেদিকে।…

গিরীন—এ্যাঁ।

শরৎচন্দ্র—হ্যাঁ ভাই, বাবার সঙ্গে যে আমার শেষ দেখা হয়েছিলো শ্মশানে। দূরে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো সদ্য পিতৃহারা ছোট ভায়ের দল, বল্লে সেই যদি এলে দাদা, একটু আগেও আসতে পারলে না, বাবা আমাদের 'দাদা দাদা' করেই যে শেষে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন।·· এতো পাষাণ তুমি তো ছিলে না দাদা।

গিরীন—ওঃ! ভগবান।

শরৎচন্দ্র—হাতে ছিলো না এক কপর্দক…কাঁধে ছিলো দারিদ্র্যের যোয়াল আর দায়িত্বের এক বিরাট বোঝা। কে নামাবে সেই দুঃসহ গুরুভার! কাদায়-জলে গড়া মানুষের ভগবান·· তোমাদের কল্যাণময় ভগবান কোথায় মিলিয়ে গেল সেদিন

গিরীন—বিপদেই তো তাঁকে উপলব্ধি করা যায় শরৎদা!

শরৎচন্দ্র—হ্যাঁ, উপলব্ধি করলাম সেদিন, সেই শ্রাদ্ধকৃত্যের দিন—যেদিন শেষ সম্বল সাইকেলখানা মাত্র আশী টাকায় বেচে দিয়ে সমস্ত দেবতাকে প্রীত করতে হয়েছিলো।

গিরীন— সংসারের দুঃখদারিদ্র্যের আর নৈরাশ্যের কশাঘাতে মানুষের মন মাঝে মাঝে সংশয়াচ্ছন্ন হয় বটে তাঁর ওপর, কিন্তু সেটাই তো মানুষের একমাত্র স্বভাব নয় শরৎদা।

শরৎচন্দ্র—হবেও বা। ছেলেবেলায় আমার ঠাকুরদেবতায় বিশ্বাস ছিলো,

বড় হয়ে সেটা হারিয়ে গিয়েছে, এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

গিরীন—[কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া]—একটা কথা জিগ্যেস করি। অনেক জায়গা তো ঘুরলে, কোথাও কোন কাজের সন্ধান পেলে শরৎদা ?

শরৎ—কাজ ! গিরীন, আমি একটা ছন্নছাড়া ভবঘুরে। কোন কাজই দেখি আমার ধাতে সয়না বেশীদিন। মার মৃত্যুর পর চেষ্টা-চরিত্র ক'রে একবার একটা চাকুরী জুটিয়েছিলাম রাজ-বানলী এষ্টেটে রাজা শিবশঙ্কর সাহুর অধীনে। সঙ্গে প'ড়ে বন্দুক ছোড়াও শিখেছিলাম। কিন্তু, শিকারী আর চাকুরী কোনোটাই বেশীদিন সহ্য হলো না···

গিরীন—যা হবার তা'তো হয়ে গেছে। বর্মা মুল্লুকে যখন এসেই গেছো, তখন তো তোমাকে একটা কিছু করতে হবে শরৎ-দা ?

শরৎ—ধর্ণা তো তাই দিলাম অনেক জায়গায়। পেগু, টোংগু ঘুরে শেষে আবার এখানে ফিরতে হলো। মেসোমশাই যদি এখানে মারা না পড়তেন···

গিরীন—ডি, এ, জি'র অফিসে কাজ ক'রবে ? মণিবাবুকে বলে আমি চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।

শরৎ—সে যা হয় হবে। কিন্তু তুমি এদিকে কোথায় এসেছিলে ?

গিরীন—এক সদ্যবিধবা ভদ্রমহিলা আর তাঁর শিশুসন্তানকে জাহাজে তুলে দিতে। স্বামী ছিলেন মৌবিন জেলার এক জন পোষ্ট মাষ্টার। আজ চারদিন হলো বসন্ত হয়ে মারা গেছেন তিনি। এদিকে জাহাজের হেলথ অফিসারের ভীষণ কড়াকড়ি আইন—শিশুটির মুখে সদ্য বসন্তের দাগ দেখে জাহাজে তুলল না।

শরৎচন্দ্র –হুঁ ! কি করবে তা হলে ? কোথায় যাচ্ছো এখন ?

গিরীন—যাচ্চি এখন একটা গাড়ি ডাকতে। তারপর বিকেল ট্রেণে পেগুর পি-ডবলিউ-ডি'র এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্-ইঞ্জিনিয়ার মিঃ সি, কে, সরকারের বাড়িতে নিয়ে যাবো।

শরৎ—ও।

গিরীন—বিকেলে তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে শরৎদা ? তুমি তো ভালো মাছ শিকারী, সেখানে মাছ ধরার ভালো ব্যবস্থা আছে। সুন্দর সুন্দর প্যাগোডাও আছে। বিকেলবেলায় বর্মী ছেলে মেয়েরা ফুল নিয়ে দলে দলে যায় সেখানে।

শরৎ–[বিস্মিতভাবে]—হুঁ ! বর্মী ভাষাটা ভালভাবে জানলে ওদের মেয়েদের সঙ্গে একটু হাসি-ঠাট্টা করা যেতো।

গিরীন—ওরা কিন্তু তামাসা পছন্দ করে না। বেগতিক বুঝলে একেবারে 'ফনানে ছা' ক'রে ছেড়ে দেবে।

শরৎ–'ফনানে ছা' কি ?

গিরীন–জুতোপেটা। এদেশের মেয়েরা স্বাধীন। শতকরা নব্বইজন লেখাপড়া জানে। ব্যবসা বাণিজ্য, ধর্মকর্ম সব কিছু মেয়েদেরই হাতে। এরা অত্যন্ত সবল আর আমুদে। কিন্তু সামান্য কারণে অপমানিত হলে এরা তৎক্ষণাৎ পায়ের চটি খোলে,—পথেঘাটে কতদিন কত সাহেবকে ধ'রে জুতোপেটা করতে দেখেচি আমি। পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশের মেয়েদের বোধ হয় এতো সাহস নেই।

শরৎ–বটে ! মেয়েগুলি দেখতে তো বেশ সুন্দর ! কিন্তু মেজাজটা অমন মিলিটারী কেন ?

গিরীন—এরা যে বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি !

শরৎ—শুনেচি, আগে নাকি মগের মুল্লুকে বাঙালী বাবুরা এলে তাদের এরা যাদুমন্ত্রে ভেড়া বানিয়ে রাখতো ?

গিরীন—[হাসিয়া]—বিচিত্র নয়। তবে, সেটা বোধ হয় ছিলো মান্ধাতার আমলে শরৎ-দা।

[হঠাৎ দূর হইতে এক যন্ত্রণাসূচক কাতর করুণ চীৎকার সেখানে ভাসিয়া আসিল।]

শরৎ— গিরীন···গিরীন, ওকি! ও কিসের চীৎকার! এমন মুমূর্ষুর কান্না কোথা থেকে আসে···কি হলো?

গিরীন—[একটু চুপ থাকিয়া] আমি জানি, অনেকবার শুনেচি, জেনেচি এ কান্নার সন্ধান শরৎ-দা। যাকগে—তুমি চলো এখন।

শরৎ—না, তোমাকে বল্‌তেই হবে গিরীন!

গিরীন—বেশ, শোন। আসন্নপ্রসবা প্রসূতির কান্না ওটা। এদেশের প্রাচীন প্রথা অনুসারে আনাড়ী ধাত্রীরা প্রসূতিকে মাটিতে শুইয়ে তাড়াতাড়ি করার জন্যে তার পেটের ওপর উঠে দাঁড়ায়··· পেট টেপে জোরে জোরে! ওটা তারই জের।

শরৎ—[আঁৎকাইয়া উঠিয়া] কি পৈশাচিক কাণ্ড! গিরীন, না আমি মানবো না—তুমি লোকজন ডাকো, প্রাণপণে বাধা দাও এ নিষ্ঠুর কাজে! কথা তোমার না শোনে তো মারধোর করো, ঘরবাড়ি ওদের জ্বালিয়ে দাও···। আমি যাই ওদিকে!

[প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুত সেই পথে ছুটিয়া গেলেন।]

গিরীন—[হন্তদন্তভাবে] শরৎ-দা···শরৎ-দা, আরে দাঁড়াও, কোথায় চল্লে! কি পাগল! মগের মুল্লুকে এম্নি কত ব্যাপার হামেশাই দেখবে ··

[দ্রুত সেইদিকে ছুটিয়া গেলেন।
মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

কিছুকাল পরের ঘটনা।

লোয়ার পোজনবুড়ং অঞ্চল। শরৎ-পল্লী। গায়ত্রীর কক্ষ। কাঠের ঘর। পাশে আর একটি ঘরের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। রাত্রিকাল। গায়ত্রীর ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। গায়ত্রী ও মিঃ হাজব্যাণ্ড উত্তেজিত অথচ চাপা কণ্ঠে কথোপকথন করিতেছিল। 'মিঃ হাজব্যাণ্ড' নামটি শরৎচন্দ্রের দেওয়া। আসল নাম—মিঃ ব্যানার্জি। কলিকাতার ধনীর বিলাসী সন্তান, পরণে তার বিলাতী পরিচ্ছদ।

গায়ত্রী—না···না···না, ছাড়ুন, ছাড়ুন আপনি···

মিঃ হাজব্যাণ্ড—অবুঝ হোয়ো না, ভেবে দেখো গায়ত্রী—শুধু তোমার জন্যে···তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে···! কিন্তু, আমায় আবার আপনি বলছো কেন গায়ত্রী? তোমার এ পাগলামি আমার ভালো লাগে না। তোমার অমন রূপ আর ওই নশ্বর দেহে এই নিষ্ঠুর বিধবার সাজ দেখে চোখেও আমি আর জল চাপতে পারছি না···

গায়ত্রী—চোখ কি আপনার আছে?···চাপা দেবেনই বা কাকে আপনি? আপনার কীর্তিকলাপ অনেকেই জেনেছে। জাহাজে মেয়েদের কেবিনে, কুঞ্জবাবুদের বাড়িতে আমার অনেক কিছু ক্ষতি করতে আপনি চেষ্টা করেছিলেন! কিন্তু কপাল তো আমার ভেঙেই গেছে।·· আর নয়, দয়া করে এখানে আর আমার শেষ সর্বনাশটি করবেন না, আমায় অব্যাহতি দিন। আপনার পায়ে ধ'রে মিনতি করচি···

হাজব্যাণ্ড—[সে কথায় কান না দিয়া বেপরোয়াভাবে]—না···না···না, মিনতি চাইবার তো কোনো প্রয়োজন নেই গায়ত্রী। বুকে রাখার রত্নকে কি কেউ পায়ে ঠেলতে পারে?

গায়ত্রী—না...না, আপনি...আপনি...

হাজব্যাণ্ড—আমি, আমি কি তোমার কাছে এতই ভয়াবহ গায়ত্রী! চিন্তা করে দেখো তো—বাড়িতে থাকবার মধ্যে আছে তো তোমার, তোমারই সমবয়সী এক বাঘিনী সৎ মা, আর বুড়ো বাবা। তা' তিনি তো তোমার কষ্টে কোনোদিন মুখ তুলে তাকিয়েও দেখেন না।

গায়ত্রী—সে জন্যেই বুঝি দরদী সেজে লক্ষ্ণৌয়ে মেসোমশায়ের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ছল করে একেবারে এই মগের মুল্লুকে এনে ফেলেছেন আমার সর্বনাশ করতে ?

[উত্তেজনায় হাঁপাইতে লাগিল]

হাজব্যাণ্ড—[গদগদকণ্ঠে]—তোমার সর্বনাশ করতে এনেচি! মোটেই নয়। হৃদয়লক্ষ্মী করবো বলে এনেচি। সেই কোন্ ছেলেবেলায় কার সঙ্গে কবে করেছিলে এক মালাবদলের খেলা, তখন না জানতে কিছু, না হয়েছিলো জীবনের বিকাশ। তারপর একদিন তোমার সেই স্বামীরূপী হতভাগা দেহ রাখলো। তখন কিছু বোঝবার মতো বয়েস তোমার ছিলো না। তারপর।...ক্রমে ক্রমে এলো তোমার কাছে, তোমার দেহমনে বিকাশের দাবী।..পরিপূর্ণ নিটোল যৌবনের তীব্র উন্মাদনা! চাইলো আশ্রয়, আলোকলতার মতো তোমার ঢলঢলে তনুলতা খুঁজলো এক বলিষ্ঠ মহীরূহ...

গায়ত্রী—থামান আপনার কবিত্ব। মেয়েরা পরগাছা বটে, তবে আগাছাকে আশ্রয় করে না।

হাজব্যাণ্ড—বটে! আ-গা-ছা! এখনো তোমার দেমাক কমেনি! আ-গা-ছা!

[প্রণয়ভংগের ব্যর্থতায় ফুলিতে লাগিল]

গায়ত্রী—না…না, আমি এখন প্রকৃতিস্থা নই! আমায় আপনি ক্ষমা করুন। আমি আপনার ছোট বোনের মতো।…আপনি এখনো ভদ্র সন্তান, মা বোন নিয়ে এখনো আপনাকে বাস করতে হয় সংসারে।

হাজব্যাণ্ড—হুঁ, তা হয় বটে! তবে প্রিয়া নিয়ে বাস করারও একটা রেওয়াজ আছে সংসারে। হেঁ…হেঁ.. হেঁ, তো-মা-কে দিয়ে সেই সাধ আমি পূর্ণ করতে চা-ই গায়ত্রী।

[গায়ত্রীর দিকে দু'এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং গায়ত্রী তাহার দিকে অপলকভাবে চোখ রাখিয়া ভয়ে ভয়ে পিছু সরিতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে সে বলিতেছিল—'না…না…না। এমন সময় দরজা ঠেলিয়া বেগে শরৎচন্দ্র, গিরীন্দ্র, মিঃ ফ্রেণ্ড, নিবারণবাবু প্রভৃতি সেখানে প্রবেশ করিলেন। গায়ত্রী সেই ফাঁকে আলুথালুভাবে পাশের ঘরে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।]

শরৎচন্দ্র—তিষ্ঠ বাবা ইমিটেশন্ হাজব্যাণ্ড। প্রেম করতে যাওয়ার আগে পাদুকা খাওয়ার অভিজ্ঞতা কিছুটা সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। সেটাতো তোমার এখনো বাকি আছে বাপধন। এই নাও তোমার মায়ের চিঠি, কুঞ্জদার ঠিকানায় এসেছিলো এটা। বুড়ো নবীন মুখুজ্যের বিধবা মেয়েকে ঘরের বার করে এনে অনেক দূর এগিয়েও ছিলে বাকি এখন শুধু পুলিশের বালা আর জুতোর মালা। নাম ভাঁড়িয়ে স্বামী স্ত্রী সেজে মগের মুল্লুকে বেশ স্ফূর্তি করা যায়, না ?

হাজব্যাণ্ড—[থতমত ভাবটা কাটাইয়া লইয়া কর্কশকণ্ঠে]—'হু দি ডেভিল্ ইউ আর টু ইন্টারফেয়ার্ ইন্ মাই এ্যাফেয়ার্?'

শরৎচন্দ্র—'উই হ্যাভ্ কাম্ টু টিচ্ ইউ এ লেস্‌ন্, ড্যাম্ স্কাউণ্ড্রেল্!'

[সঙ্গে সঙ্গে হাজব্যাণ্ড বারুদের মতো জ্বলিয়া উঠিয়া শরৎচন্দ্রের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।]

নিবারণবাবু—তবে রে হারামজাদা···তোকে·· তোকে আজ আমি খুন করে ফেলবো।

[প্রবল উত্তেজনায় লাফাইয়া গিয়া হাজব্যাণ্ডের গলা চাপিয়া ধরিলেন। সে ভীষণভাবে আর্তনাদ করিয়া সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। শব্দ শুনিয়া গায়ত্রী অসংযত বেশবাসে অবিন্যস্ত চুলে পাগলের মতো সেখানে ছুটিয়া আসিয়া কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।]

গিরীন্দ্র—তোমার আর কোন ভয় নেই মা। পাষণ্ড তার উপযুক্ত সাজা পেয়েচে। তবে এ সব জাত সহজে মরে না। আর যদি মরেও যায়, তো সে দায়িত্ব আমার—যদি বেঁচে ওঠে, তবে কালকের জাহাজেই ওকে কলকাতায় চালান করে দেবো। তুমি এখন ঘরের মধ্যে যাও মা। কুঞ্জদার বাড়ি গিয়ে পরামর্শ করে আমরা লক্ষ্ণৌয়ে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে চিঠি লিখচি তোমার মেশোমশাইকে।]

[গায়ত্রী সেখান হইতে চলিয়া গেল]

নিবারণবাবু—এখন উপায় কি গিরীনবাবু? পাষণ্ডটা মরবে নাকি!

গিরীন—দেখি চেষ্টাচরিত্তির ক'রে! এই রাত্রে ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া·· উল্টে তাতে আবার হবে এক নূতন ফ্যাঁসাদ! মিঃ ফ্রেণ্ড সন্ধ্যের দিকে গিয়ে যেভাবে সংবাদটা দিলে, তাতে যে ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে ··

মিঃ ফ্রেণ্ড—না···আমি···মানে, সমস্তদিন কাজের ধান্ধায় ঘুরে বাড়ি

ফিরে দেখি মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ, ভেতর থেকে এই রকম চাপা কথাবার্তার আওয়াজ আসচে…। উপায়ান্তর না দেখে ভয়ে আপনাদের কাছে…

গিরীন—সে তো ভালোই হয়েচে… কিন্তু এখন…

শরৎচন্দ্র—তোমার তো 'ফার্ষ্ট এড' জানা আছে গিরীন। এসো না, দু'জনে লেগে পড়া যাক্।

গিরীন—অগত্যা! ভাই ফ্রেণ্ড, ওঘর থেকে একটু বরফ আর স্মেলিং সল্টের শিশিটা তাড়াতাড়ি খুঁজে আনুন। জালে যখন জড়িয়ে পড়েইচি, তখন মুক্তির উপায় আমাদেরই করে নিতে হবে।

[হাজব্যাণ্ডের সেবা চলিতে লাগিল। বিধিমতো চেষ্টা চলিবার পর ক্রমে তার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। শরৎচন্দ্র তাহাকে গরম দুধ ও পাঁউরুটি খাইতে দিলেন। সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া চারিদিকে দেখিয়া লইয়া নিঃশব্দে তাহার খাদ্য গ্রহণ করিল। রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে]

শরৎচন্দ্র—তোমার কুকীর্তি সমস্ত শুনেছেন কুঞ্জবাবু। গায়ত্রীর বাবার কাছে টেলিগ্রাম করা হয়েচে। উত্তর এলেই হাতে হাতকড় পড়বে তোমার। ভালয় ভালয় এখনি তুমি তৈরী হয়ে নাও। এই জাহাজেই তোমাকে ফিরে যেতে হবে। আর মাত্র' দু এক ঘণ্টা সময় হাতে আছে।

হাজব্যাণ্ড—যাবার আগে শুধু একটিবার গায়ত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবেন কি?

নিবারণবাবু—(ধমক দিয়া)—পাপেরও একটা সীমা থাকে, তুমি পাপিষ্ঠেরও বেহদ্দ! অতি নির্লজ্জ! কোন্ মুখে আবার গায়ত্রীর নাম করছো? যদি ভালো আর চাও তো দ্বিরুক্তি

না ক'রে এখনি জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে পথ দেখো, নইলে এমন শাস্তি দেবো যে জীবনে তা আর তুমি ভুলতে পারবে না।

[অপমানক্ষুব্ধ হাজব্যাণ্ড ক্ষুণ্ণ মনে ফাঁসীকাষ্ঠের আসামীর মতো ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল। নিবারণবাবু তাহার অনুসরণ করিলেন।]

গিরীন—গায়ত্রীমাকে তো শয়তানের খপ্পর থেকে ছাড়ানো গেলো, কিন্তু উপস্থিত ওর দেখাশোনার কি ব্যবস্থা করা যায় বলো দেখি শরৎদা?

শরৎচন্দ্র—কেন? ফ্রেণ্ড তো রইলেন এখানে, উনিই দেখাশোনা করুন। অবশ্য, আমারাও এঁকে যথাসাধ্য সহায্য করবো।

মিঃ ফ্রেণ্ড—তাতো করবেন। কিন্তু, কি বলছেন মশাই? সমস্তদিন আমি ওঁকে একা···মানে···রাত্রেও তো ··

শরৎচন্দ্র—আরে মশাই, ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন? আমরাও তো কাছে-পিঠে থাকি। আমার পল্লীর লোকগুলোও বড় ভালো। আমি তাদের মেয়েদের বলে দেবো, তারাও অবসর সময়ে গায়ত্রীদেবীর সঙ্গে গল্পগুজব করবে।

মিঃ ফ্রেণ্ড—সবই তো হবে। আমার অবস্থা'টা তো আপনারা বুঝলেন না। নিঃসম্বল মানুষ, বিদেশে আসছিলাম কাজকর্মের ধান্ধায়, জাহাজে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথায় কথায় আলাপ হলো। ওই নকল হাজব্যাণ্ডটি আমার নাম দিলেন মিঃ ফ্রেণ্ড। বললেন—চলুন, আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আমরাও স্বামী-স্ত্রী—একা একা। রাজী হলুম। ভাবলাম, তবু আস্তানাটা তো জুটলো! কিন্তু, এই কাণ্ড কি আর তখন জানতুম!

শরৎচন্দ্র—যা হবার তা তো হয়েই গেলো পাঁচকড়িবাবু। এখন ওঁকে

রক্ষণাবেক্ষণ তো করতে হবে। আপনি ওঁর সঙ্গে কিছুটা পরিচিত, তাছাড়া আপনি তো আর নকল ফ্রেণ্ড নন·

মিঃ ফ্রেণ্ড—না·· না শরৎবাবু, আমি তা পারবো না। এর পরে আমারও আর এখানে থাকা চলে না, লোকচক্ষে·· সমাজে···

শরৎচন্দ্র— সমাজ! মুসলমান খৃষ্টানদের সমাজেও নিগৃহীতাদের একটা ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ভদ্র হিন্দু সমাজে এদের কোনো স্থানই যে নেই ভাই। এই হৃদয়হীন সমাজব্যবস্থা, এই নিদারুণ প্রহসনের পেছনে যে কী ভয়ানক মর্মবেদনা জমাট বেঁধে আছে তা শুনলে বোধ হয় আপনাদের রক্ত জল হয়ে উঠবে! সমাজ · সমাজ কি আজ চোখ মেলে দেখবে, বুঝবে কি··· হিসাব নেবে কি, এই উৎপীড়িতা নিষ্পাপচরিত্রা ব্রাহ্মণকন্যার ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলের··

[উচ্ছ্বসিত আবেগে রুদ্ধ হইল তাহার কণ্ঠ। সকলে বিস্মিত, স্তব্ধ। পর্দা পড়িল মঞ্চে।]

তৃতীয় দৃশ্য

কয়েক মাস পরে।

গায়ত্রীর কক্ষের সম্মুখ। রাত্রিকাল। শরৎচন্দ্র বারেন্দার একপ্রান্তে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বেসামাল প্রকৃতি—শোঁ-শোঁ হাওয়া, বৃষ্টি, ঝড়ের কান্না, ক্বচিৎ চকিত বিজলী। মঞ্চে ক্ষীণাভ আলো। করুণ সুর। শরৎচন্দ্র ধীরে ধীরে আসিয়া একপ্রান্তে একটি বাঁশের ইজিচেয়ারে বসিলেন। চোখে মুখে অন্তরে তাঁর ঝড়ের তন্ময়তা। ভাবতন্ময়কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন—

শরৎচন্দ্র—এ কী…এ কি তবে সেই মহাশক্তির প্রকাশ! কোথাও রুদ্র-বিভীষণা…কোথাও বা শান্ত লাবণ্যময়ী নারীমূর্তি! কখনো প্রিয়া, কখনো প্রাণ! কখনো বা উদ্দাম প্রণয়ী… কখনো রহস্যময়ী! কখনো মাতা…কখনো কন্যা…

[সহসা কয়েক ঝলক বিদ্যুতের চমক! করুণ সুরের ক্রন্দন! মঞ্চের পশ্চাদ্‌পটে বেহালার রিন্‌রিনে ছড়ি।…কয়েক মিনিট স্তব্ধ রহিল শরৎচন্দ্রের কণ্ঠ …দুচোখে শুধু ধারা। আবেগজড়িতকণ্ঠে তিনি গাহিয়া উঠিলেন।]

॥ বেহাগ—খাম্বাজ ॥
॥ তাল—যৎ ॥

ভরা চামেলির বুকে যে কি ব্যথা
ভিজে গেছে বনতল!
মধু যামিনী ফেলিছে নিশ্বাস—
চন্দ্রিল চোখে জল!
সুরভিত ক্ষণে শ্যামলের বাঁশী
দেয়না যে সাড়া—বুঝি বা উদাসী;
প্রেম-যমুনায় বাসর-শয়নে
কাঁপে নীল শতদল!!
ঝরা ফুলে হেথা আত্মা গুমরি কাঁদে,—
উতলা আবেগে বালুচরে বাসা বাঁধে!
…নিখিল ভুবন মাতে অভিসারে
মায়া-কাননের এপারে-ওপারে,

বিরহিনী প্রিয়া তরুণী আশার ধূপ জ্বালে পলে পল !

[গানের মাঝামাঝি সময়ে প্রমত্ত ঝড় 'সাঁ' করিয়া বাজিল। গায়ত্রীর রুদ্ধ দরজায়। খুলিয়া গেল দরজা। শরৎচন্দ্রের দরদঢালা কণ্ঠের সম্মোহনী শক্তিতে গায়ত্রী শয্যা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দরজায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া তন্ময় চিত্তে তাঁহার গান শুনিতে লাগিল। চোখে নামিতেছিল ধারা। শরৎচন্দ্রের কোনদিকে খেয়াল ছিলো না। গান শেষ হইলে পর গায়ত্রী সেখান হইতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।]

শরৎচন্দ্র—কে !·· গায়ত্রী ? এই যে, উঠেচো দেখচি। ঝির কাছে শুনলাম, সমস্তদিন নাকি তুমি খাওনি গায়ত্রী ?

গায়ত্রী—[সে কথায় কান না দিয়া]—কি মিষ্টি আপনার গলা ! এতো দরদ···এমনি প্রাণস্পর্শী···যে শুনলেই আমি আমাকে হারিয়ে ফেলি ! সুরের বাণী যেন আপনার কণ্ঠে মূর্তিমতী হয়ে ওঠে !

শরৎচন্দ্র—তা হয়তো হয়, নইলে এইভাবে তোমাকে উঠিয়ে এনে এমন করে আমার জন্যে প্রশস্তি গাওয়ানো যেতো না। কিন্তু আমার প্রশ্নের তো কোনো জবাব দিলে না গায়ত্রী ?

গায়ত্রী—[একটু পরে]—খিদে ছিল না, তা ছাড়া···

শরৎচন্দ্র—তা ছাড়া ?

গায়ত্রী—মনটাও ভালো নেই···

শরৎচন্দ্র—হুঁ !

গায়ত্রী—এম্নি কপাল নিয়ে জন্মেছিলাম···দুঃখে দুঃখে জীবন গেল·· ইজ্জত সম্ভ্রম ! মাগো·· ···!

শরৎচন্দ্র—আমি সমস্ত শুনেচি। মিঃ ফ্রেণ্ড দেশে চলে যাবার পর থেকে সুযোগ বুঝে তার এখানের পুরণো মনিব কাঠগোলার মালিক

ওই শশাঙ্কটা তোমার পিছু নিয়েছে—কিন্তু তোমার কোনো ভয় নেই গায়ত্রী। এ অঞ্চলের সকলে আমাকে চেনে, ভালবাসে। আমি তাদের বলে দিয়েছি আড়াল থেকে ওকে লক্ষ্য রাখতে। ওই শশাঙ্ক-নাশনের ব্যবস্থা করতে তারা একটুও দ্বিধা করবে না। আর এর মধ্যে হয়তো তোমার মেশোমশায়ের জবাবও এসে পড়বে।

গায়ত্রী—কতো অসহায় হয়ে যে পথে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম—এখন দেখছি পথের কাঁটাই হচ্চে সবচেয়ে মারাত্মক! প্রাণের জন্যে একটুও আর মায়া নেই, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণটা এই পোড়া দেহের ওপর ভর দিয়ে থাকবে ততক্ষণ যে কেমন করে এর সম্ভ্রম আব্রু বাঁচিয়ে চলবো···

শরৎচন্দ্র—সে শক্তি সে অধিকার থেকে কেউই তোমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না। জীবনের তাগিদকে উপেক্ষা করে পদে পদে মনুষ্যত্বের এই নির্লজ্জ অবমাননাকে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না গায়ত্রী। মানুষের গড়া সমাজের এই কঠোর বিচার বিধান—এ শুধু কশাইখানার প্রহসন ছাড়া···

গায়ত্রী—কিন্তু এ ছাড়া আমাদের আর কি উপায়ই বা আছে।

শরৎচন্দ্র—আছে, আর সেই প্রস্তাবই আমি তুলবো তোমার কাছে। সমাজ সংসারের এই কুসংস্কারকে প্রশ্রয় না দিয়ে চিরকাল এর বাইরে থাকাও শতগুণে ভালো···

গায়ত্রী—[চমকিয়া]—কি বলছেন আপনি? বড় অস্পষ্ট আপনার অভিমত, ঠিক বুঝতে পারছি না আমি।

শরৎচন্দ্র—যারা তোমার মত নারীর সমস্ত গুণ সব কিছু দাবীকে অস্বীকার করে তোমাকে পথে এনে ফেলেছে, ভগবান বলে যদি কেউ কোথাও থাকেন তো সে নালিশ তাঁর কাছে তোলা রইলো।

তবে, তোমার আজকের এই দুর্দিনে তোমার সমস্ত সামাজিক বাধা তুচ্ছ করে পথের ধুলো থেকে কেউ যদি তোমায় ঘরে তুলে নিতে চায় গায়ত্রী ?···

গায়ত্রী— সে সৌভাগ্য আমার নেই। ঝরা ফুলে দেবতার পূজা হয় না।

শরৎচন্দ্র—কিন্তু বিবাহই তো এজগতে নারীত্বের একমাত্র সামাজিক মর্যাদা···

গায়ত্রী— হয়তো তাই, তবে দেবতার ভোগে তো উচ্ছিষ্টের কোনো স্থানই নেই !

শরৎচন্দ্র—উচ্ছিষ্ট তুমি তো নও গায়ত্রী। তুমি যে অনাঘ্রাত প্রভাতের ফুল !

গায়ত্রী—তাইতো আর আমি কারো কাছে ছোটবোনের অধিকার হারাতে চাই না দাদা।

[পায়ের কাছে লুটাইয়া প্রণাম করিল।
মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।]

চতুর্থ দৃশ্য

কিছুদিন পরে।

শরৎ-পল্লী। বস্তি অঞ্চল। চক্রবর্তীর কাঠের বাড়ির সম্মুখ। বারেন্দার অন্য প্রান্তে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আরেকটি ঘরের দরজা দেখা যাইতেছে। এই ঘরটি শরৎচন্দ্রের। চক্রবর্তীর ঘরের সম্মুখ দিয়া এই ঘরের প্রবেশপথ।

চক্রবর্তী প্রৌঢ়, বিপত্নীক—লোহা-লক্কড়ের কারখানার মিস্ত্রী। চরিত্রে কারখানার ছাপ সুস্পষ্ট। নৈশ-মজলিসে সমধর্মী সহকর্মী জুয়াড়ী নেশাখোর মাতালের ব্যাপক হৈ-হুল্লোড়। সংসারে আছে একমাত্র বিবাহযোগ্যা মেয়ে, নাম—শান্তি।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। চক্রবর্তীর ঘরের মধ্যে মত্তকণ্ঠের বিকট বেতালা চীৎকার চলিতেছিল। জড়িতকণ্ঠে কে যেন বলিতেছিল—'নক্কি...নক্কি...পাইলে যাচ্চো কেন মাইরি—। ই.. চুক্.. চুক্...চুক।" অকস্মাৎ ভিতর হইতে শান্তিকে বিপন্নমুখে ভয়ার্তদৃষ্টিতে দৌড়াইয়া আসিতে দেখা গেল। বারেন্দায় আসিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া এদিক-ওদিক তাকাইয়া শেষে উন্মুক্ত দরজা দিয়া সে শরৎচন্দ্রের ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে মত্ত লোকটি টলিতে টলিতে সেখানে আসিয়া সিঁড়ির মুখে থপ করিয়া বসিয়া পড়িল। চক্রবর্তী ও তাহার পেছনে পেছনে মত্ত সঙ্গীদল সেখানে ছুটিয়া আসিয়া পড়িল।

চক্রবর্তী—শান্তি ..শান্তি, দেখো দিকি.. হাবামজাদী মেয়েটা যে কোন্ চুলোয় গে' মলো !—ঘোষাল ঘোষাল, ওঠো দিকি—

ঘোষালবুড়ো - [পতনাবস্থায় মদের বোতল বগলে টলিতে টলিতে]—এঃ...চুক্...চুক্ ..চুক্, অ-হ-হ, শ্বোরো-গো, এ কালামুখ আর এহকালে দেখাবো না...হিঁ , হিঁ...হিঁ... !

[নেশার ঝোঁকে হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল]

চক্রবর্তী—[কোঁচার খুঁট দিয়া তার চোখ মুছাইতে মুছাইতে]—চুপ করো বাপ, পুরুষ মানুষের কি রোদন করা সাজে !

[ঘোষালের মুখে মদের বোতলটি ধরিল]

ঘোষাল—[কয়েক চুমুক টানিয়া]—আমার কি হবে শ্বোরো গো ! আমার পরিবার যে পালিয়ে গেলো তোমার চোখের ওপর দে' গো !...

মানিকলাল—[বক্ দেখাইয়া]—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ ! মাইরি আর কি ! ওঁয়ার বাবাকেলে সাতপাকের বৌ যেন ! শেতলা, কঙ্কেটা বেড়িয়ে দেতো, যত্তো সব ঘাটের মড়া !

ঘোষাল— তবে রে শা—! তোবে যদি না জ্যান্তো পুতি, তো আমি লটবর বাম্‌নের সন্তানই নই…অ-থক্‌থক্‌…

[প্রবলভাবে কাশিতে লাগিল।]

[সহসা দূরের একটা আলো-আঁধারে খুপ্‌রি থেকে নারীকণ্ঠের ইনুনি-বিনুনি চীৎকার শোনা গেল। তাহাকে কে একজন পুরুষ জড়িত-কণ্ঠে সান্ত্বনা দিতেছিল—'কাঁদিস্‌নি সদি, শোক পাষণ কর্‌, স্বোয়ামী পুত্তুর স-ও-ব আবার তোর এইখেনে হবে।'…এমন সময় শেতলচাঁদ একখানি একানে হারমোনিয়াম গলায় ঝোলাইয়া মাথা দোলাইয়া গাহিতে গাহিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।]

(তরজার ঢঙে)

…হায়…হায়, কুলৃসে ওঠে শতেক-খাকী—
কংস মলো মাঝ রাতেতে
কুবুজা কাঁদে অচুম্বিতে—
ইদিকে রাধি ছুঁড়ির হাসি দেখে—(ও হায়-হায়-হায়)
ও মরি—চুম্‌রে ওঠে নোলোকনাকী!'—[দ্রুত লয়ে দু'বার· ·]

মানিকলাল—[অংগভংগী করিতে করিতে সোল্লাসে তাহার মুখের কাছে আগাইয়া গিয়া মুখে মুখে তাল দিল। গাঁজার কল্কেটি তার হাতে ঠিক ধরা ছিল।]—হায় হায় ছা, ধাঁ-কিটি-কিটি ধাঁ-কিটি-কিটি, ত্রালাং তা। বেঁচে থাক বাওয়া শেতলাচেদে চৈতে গাজন প্‌যযন্তো।

[সঙ্গে সঙ্গে কল্কেটি মুখে ধরিয়া একটি মারাত্মক টান দিল। সমজদারের দর্শন পাইয়া শেতলচাঁদ সেখানে

বসিয়া পড়িয়া সোল্লাসে পরিত্রাহি বেলো টানিতে লাগিল]

ঘোষাল—আমার টাকা কটি তবে ফেলে দাও বাওয়া,—হক্কের টাকা। ও সব রুকৃখ্যু ঝামেলার মদ্দি আর আমি নেই। [বোতল থেকে কয়েক চুমুক টানিয়া]—এই বয়েস পয্যন্ত লোহা ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে শরীলের জোড়েন আমার ঢিলে হয়ে যাচ্চে শ্বৌরো…

মানিকলাল—তাইতো বলচি, মায়া আর বাইড়োনি খুড়ো। অনেকদিন হলো। ইদিক খাটিয়া দড়ি কলসী স ব-ই আমাদের মজুদ, তুমি ছেরেপ উঠে পড়ো বাওয়া!

ঘোষাল—এই মান্‌কে, ফের…! অ…খক… খক… [পুনরায় কাশিতে লাগিল।]—টাকা লিয়েছে, কথাও দিয়েচে—বে' কত্তে আর বাকী আছে কি ব্যা? …অ…খক্…খক্, টাকা কটা তুমি ফেলে দাও শ্বৌবো, ইঃ…চুক্…চু…পোষ মানে কিনা ইবার দেখে লোবো!

শেতলচাঁদ—[বেলো টানিতে টানিতে আপন মনে তরজার ঢঙে ফিরতি তালে গাহিতে ছিল।]

…'রণে মলো অভিমন্যু
মন্দোদরী শোকে আচ্ছন্ন
ন'দে বিনে কেষ্টো শূন্য (হায় মরি…মরি…)
—দেখে এনুম্ ম্যান্‌ডালের খালে!'—(পুনরায় দ্রুত লয়ে)

মানিকলাল—বেড়ে…বেড়ে, বলিহারি বাওয়া শেতলা! ধাঁ করে তুমি একবার ইদিক এসো দিকি খুড়ো, শরীলের জোড়েনগুলো তোমার ত-র্-র্ হয়ে যাবে মাইরি শেতলা শ্লা-র গানে।

শেতলচাঁদ—[কয়েক চুমুক পান করিয়া]—এ্যাই-ও…চোপ!

মানিকলাল—কেতরে উঠলে কেন খাওয়া ডাঁসা সম্বন্দি, কি অপরাধটা আবার কল্লুম তোমার খুরে! ছেরেপ ওপরটাইমের টাকা ক'টা একবার হাতে আসতে দাও, তারপর যদি তোমার বোন দামিনীকে আমি ঘরে না আনি তো কৈবর্ত থেকে খারিজ। বলে—বিশ্বাসে মিলিবে বোনাই, তক্কে ধানুনক্কি···

[ঘোষালের হাত থেকে মদের বোতলটা নিয়া চুমুক দিতে লাগিল]

ঘোষাল—সবই তোমাদের লট্‌ঘটি ব্যাপার। না খাওয়া, ভা-আ-লো বুঝি না! হাতের বউ হাত ফস্‌কে গেলো,—আমিও খাওয়া মরদকা বাচ্ছা···ই অপমান···অ···খক্‌·· খক্‌·· দেখে লোবো আমি· ।

মানিকলাল—মা-য়া, খুড়ো স-ও-ব মা-য়া! খালি খাঁটি হচ্চে এই সুরা—সুরেশ্বরী।—(সুর করিয়া কাংসকণ্ঠে) —সুরা পান করিনে শ্যা-আ-মা···

ঘোষাল—এ্যাই মান্‌কে, ফের্‌···র্‌···

[আক্রমণ করিতে গিয়া পড়িয়া গেল, মুখ দিয়া গাঁজা কাটিতে লাগিল]

চক্রবর্তী—[গাঁজা টানিয়া এককোণে ঝিম্ হইয়া বসিয়াছিল, শব্দ শুনিয়া চকিত হইয়া আগাইয়া গেল।]—সেরেচে!···মুখ দে গাঁজা কাটে যে! ঘোষাল·· ঘোষাল, ওঠো—চলো, বাড়ি চলো। ঘোষাল···? ওরে ও শেতলা, ও মান্‌কে, এদিক এসে···

মানিকলাল—ধ্যেৎ, ছাড়ো দিকি তুমি। কোনো ভয় নি তোমার। ও রসের খেলা, পাকি মাল পেটের মদ্দি চুমকুড়ি কাটলে একটু অমুন মায়া হয় বাবাজি। শেতলা, ইদিক আয়। খুড়ো আজ একটু ধাড়সেচে, নিম্‌মল হাওয়া খানিকটা

শরীলের উপরি চলিয়ে যেতে হবে। মায়া···মায়া!—
(কাংসকণ্ঠে) ··সুরা পা-া-ন···করি না গো মা শ্যামা ··া···া

[অচৈতন্য ঘোষালকে ধরিয়া মানিকলাল চলিতে লাগিল। শেতলচাঁদ হারমোনিয়াম ঝোলাইয়া বেলো টানিতে টানিতে পিছু পিছু চলিল]

চক্রবর্তী—নাঃ, আর পারি না! হারামজাদী মেয়েটাকে নিয়ে বুড়ো বয়েসে আমি জেরবার হয়ে গেলুম, আসুক আজ···ওকে যদি না আমি খুন করিতো ··

[শরৎচন্দ্র আসিতেছিলেন। হাতে তাঁর একগুচ্ছ পাণ্ডুলিপি]

শরৎচন্দ্র—কাকে আবার খুন করতে চললে গো এই রাত্রে?

চক্রবর্তী—এই যে, তুমিই বলো তো বাবু, হারামজাদী মেয়েটাকে এরপর খুন করা উচিত কি না?

শরৎচন্দ্র—কাকে? শান্তিকে!

চক্রবর্তী—বিলক্ষণ! ও হাড়জ্বালানি ছাড়া এ বুড়োর হাড়ে আর ডুগডুগি বাজাবে কে?

শরৎচন্দ্র—কেন, শান্তিতো বেশ ভালো মেয়ে। কি করলে আবার, কোথায় সে?

চক্রবর্তী—কোন্ যমরার বাড়ি ছুটে পালালো তা কি আর জানি! তুমি তো জানো বাবু, ঘোষালবন্ধুর কাছে আমি বেশ কিছু ধারি।

শরৎচন্দ্র—বটেই তো!

চক্রবর্তী—বলো দিকি! তবে, তার সুবিধে-অসুবিধেটাও তো আমাদের দেখতে হবে। নাকি গো।

শরৎচন্দ্র—নিশ্চয়ই

চক্রবর্তী—এ্যাই। ঘোষালের টাকাও আছে, ভাত কাপড়ের দুখ্যু মেয়েটি আমার কোনোকালে পাবে না—তাই তাকে ধরো না কেন তোমার সেধে যেচে রাজিও করিয়েছিলুম…

শরৎচন্দ্র—হুঁ!

চক্রবর্তী—আমার দেনাটাও সে মাপ করেছিলো স্রেফ্ মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে। তা' কথা যখন দিয়েচি, তখন ধরো না কেন বে' তো হয়েই গ্যাছে।

শরৎচন্দ্র—হুঁ। তাতে শাস্তির খুন করার কারণটা কি হলো?

চক্রবর্তী—আহা, সেই কথাই .তা বলছি। আজ সন্ধ্যেয় সে—হেঁ…হেঁ, ভাবী বৌয়ের সঙ্গে ঘরের মধ্যে আমোদ ইয়ে একটু করতে গেছিলো! ধাঁ করে মেয়েটা সেই সন্ধ্যে থেকে কোথায় যে পালালো…এখন আমি কি করি?

শরৎচন্দ্র—বুঝলাম। কিন্তু তোমার মেয়ের বোঝবার বয়েস হয়েচে, তারও পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে?

চক্রবর্তী—মানে! পাত্র হিসেবে ঘোষাল খারাপ কিসে? তবে হ্যাঁ, বলতে পারো—সে একটু নেশা-ভাঙ্ করে, এইতো? তা সে তো আমিও করি। ও কিছু নয় …কিছু নয়…।

শরৎচন্দ্র—এমনও তো হতে পারে, ঘোষাল বুড়ো ব'লে শাস্তি…

চক্রবর্তী—এ্যাঁ, কি বললে—বুড়ো? তোমার মতো লেখাপড়া লোকের মুখে এই কথা শুনবো! বয়েসের কথা যখন তুললে তখন জিগ্যেস্ করি তোমায়…বলি, বেটাছেলের আবার বয়েস কি?

শরৎচন্দ্র—আহা, মেয়ের একটা তো নিজস্ব ইচ্ছে…

চক্রবর্তী—আরে রেখে দাও তোমার ইচ্ছে। বলে—বাপ পায় না চিটেগুড় ছাওয়ালে খায় চিনি, সেই বিত্তান্ত! কিন্তু রাত

প'রভাতে আমি দেনা দি কোত্থেকে? এই কি তোর মেয়ের মতো কাজ হলো?

শরৎচন্দ্র—কতো তোমার দেনা?

চক্রবর্তী—পর্বত প্রেমাণ। তার কি হিসেব-কিতাব আচে—শুনবে কি, সে যে একমুঠো টাকা!

শরৎচন্দ্র—[একটু চিন্তা করিয়া]—ধরো, দেনা যদি তোমার কোনক্রমে মিটে যায়···

চক্রবর্তী—এ্যাঁ! মিটে যায়! বলি, তুমি দেবে নাকি—ঝড়াকসে তো বলে বসলে! এ-ক মু-উ-টো টাকা।

শরৎচন্দ্র—বেশ, একমুঠো টাকাই আমি দেবো। এবারে তোমার মেয়ের নিজস্ব ইচ্ছে পূর্ণ করতে দেবে তো তুমি?

চক্রবর্তী—[বিস্মিত চোখে তাঁহার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া]—কিন্তু, বিয়ের যুগ্যি মেয়ে, তাকে বিয়ে দিতে হবে তো?

শরৎচন্দ্র—এখন ঘোষালের মুখ থেকে তো রক্ষে পাও, পরে তখন ধীরে সুস্থে দেখেশুনে···

চক্রবর্তী—কোথায় আর দেখবো বাবু, ঘোষালের মুখের গেরাস—ও যে ছেলেদের এখন কাণ ভাঙিয়ে বেড়াবে, ··নানানখানি করবে! তা তোমার যখন এতোই দয়ামায়া তো, তুমিই কেন গরীব বামুনের মেয়েটাকে নিয়ে আমার জাতকুলটা রক্ষে ক'রে দাও না বাপু!

শরৎচন্দ্র—[কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চাহিয়া]—বেশ, তাই হবে। আমি কথা দিলুম। কালই তোমার হাতে তোমার দেনার টাকা আমি যোগাড় করে দিয়ে দেবো।

চক্রবর্তী—[অবাক বিস্ময়ের ঘোরটা কাটাইয়া কিছুক্ষণ পরে]—এ্যাঁ! এযে · এযে দেবতা···

শরৎচন্দ্র—থাক। ঘরে গিয়ে এখন শুয়ে পড়গে। রাত হয়েচে অনেক। দেখো গে—মেয়ে তোমার এতক্ষণে ঘরে ফিরে এসেছে নিশ্চয়ই!

[তাকে একরকম জোর করিয়াই ঘরের দিকে পৌঁছাইয়া দিলেন, তারপর আপন দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন]

একি! ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। চোর এলো নাকি! কখনো তো এমনটি হয়নি। কখনো তো আমার তালা দিয়ে যাওয়ার দরকার হয় না··

[দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিলেন। একটু পরে ভেতর দিকে খিল খোলার শব্দ হইল। শান্তি বাহির হইয়া আসিল। তার সর্বাংগ তখনো থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল, দু'চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল]

শরৎচন্দ্র—শান্তি! তুমি! তুমি এতক্ষণ এখানেই লুকিয়েছিলে।

শান্তি—হ্যাঁ। পথ ছাড়ুন আপনি?

শরৎচন্দ্র—কাঁদচো কেন শান্তি? ভয় নেই—বাবা আর তোমাকে বকবেন না, ঘোষালের দেনার ব্যবস্থা করে এলাম।

শান্তি—[ঝাঁঝালো কণ্ঠে]—কেন··কেন···কেন? কেন আপনি দেখাতে গেলেন এ উদারতা? শুধু বড় বড় কথা বলতেই পাবেন···মন ব লে আপনার কিছুই নেই।

শরৎচন্দ্র—মন ব'লে আমার কিছুই নেই! ···তবে কি তোমায় আমার হাতে দেবার কথা বলে ভুল করলেন তোমার বাবা। আচ্ছা, যাও তুমি। সব ভুল হয়ে গেলো···সব ভুল হয়ে গেলো···

[শিথিল পায়ে দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। পথরোধ করিল শান্তি।]

শান্তি—না···না···না, আমারই ভুল! আমায় ক্ষমা করো তুমি।···এ আশ্রয় ছেড়ে আমি আর কোথায়ও যাবো না।

[উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। মাথায় তার স্নিগ্ধ হস্ত রাখিলেন শরৎচন্দ্র। দূরে কোথায় একটা শঙ্খ বাজিয়া উঠিল।]

পর্দা পড়িল মঞ্চে।

পঞ্চম দৃশ্য

দুই বৎসর পরে।

শরৎচন্দ্রের রেঙুনের বাসাবাড়ির একাংশ। রাত দশটা। স্তূপীকৃত বই খাতাপত্রের মাঝে শরৎচন্দ্র তন্ময়ভাবে লিখিতেছিলেন। বাঁ হাতে গড়গড়ার নল। সম্মুখে একটি লণ্ঠন।

ঘোষক : নিখিল নারীচিত্তের নিবিড় রহস্য-জ্ঞাতা, অসহায়া অন্তঃপুর-চারিণীর কুহেলী প্রাঙ্গণ থেকে সংগ্রহ করলেন তাদের বিচিত্র ইতিহাস! কান্নাহাসির স্বরগ্রাম রিন্ রিন্ ক'রে বাজলো শরৎচন্দ্রের অম্লান লেখনীতে। মনে পড়লো স্রষ্টার একে একে কত কথা··· জীবনের কত বিচিত্র চিত্র।···কল্পনায় ভেসে উঠলো শৈশবসঙ্গিনী ধীরবালা,··· (মঞ্চের একদিক থেকে ধীরবালা আসিয়া শরৎচন্দ্রের পশ্চাতে দাঁড়াইল নীরবে, ঘোষকমুখে প্রতিধ্বনিত হইল তার পূর্বসংলাপ, তারপর সে ভিন্নপথে মিলাইয়া গেল) ···'ন্যাড়াদা, ও ন্যাড়াদা, তুমি যে বড্ড উল্টো বোঝ ন্যাড়া-দা!' ধীরবালাকে উপলক্ষ ক'রে সাহিত্যের মণিমন্দিরে দাঁড়ালো চিরবঞ্চিতা 'পার্বতী'। মনে পড়লো উপেক্ষিতা সাপুড়িয়া কন্যার সেই হাসি হাসি মুখ···(পূর্ববৎ বিলাসী

আসিয়া ক্ষণকাল সেখানে অবস্থান, প্রতিধ্বনি ও ক্ষণপরে অন্তর্ধান করলো)·· 'ঠাকুর, ও ঠাকুর।···বাবে, কেউ যদি অগ্নি ক'রে আমাদের যুগল ভেঙে দেয়!' সৃষ্টি হলো 'বিলাসী'র অপূর্ব চরিত্র। সৃষ্টি হলো আমাদের চিরস্মরণীয়া 'অন্নদা-দিদি'! অপরাজেয় স্রষ্টা আবার অমর সৃষ্টিতে ধ্যানস্থ! কল্পনায় দেখা দিলো ধীরে ধীরে সেই ছদ্মবেশিনী বাঈজী—। (পূর্ব চরিত্রগুলির মতো বাঈজীর আগমন, প্রতিধ্বনি ও অন্তর্ধান) —'নিষ্ঠুর, কোনদিনই কি তুমি আমার দিকে ফিরেও চাইবে না···!' কে···কে এই বঞ্চিতা নারী! কে এ বারে বারে কেঁদে বেড়ায় পিছু পিছু··! একী 'রাজলক্ষ্মী'! একী 'পিয়ারী বাঈজী'! অশ্রুর মালা নিয়ে সাহিত্যেব আঙিনায় থমকে দাঁড়ালো এবার গায়ত্রী।'···গায়ত্রী···'! (পূর্বানুযায়ী গায়ত্রীব আগমন, প্রতিধ্বনি ও প্রস্থান) '·· সে সৌভাগ্য আমার নেই। ঝরা ফুলে দেবতাব পূজা হয় না··'! 'অভয়া' কি কাঁদতে এলো মগের মুল্লুকে! 'গায়ত্রী ·'

[স্তব্ধ হইল ঘোষকেব কণ্ঠ। লেখনী কেন যেন কাঁপিয়া উঠিল। চমকাইয়া উঠিয়া শরৎচন্দ্র কহিলেন—]

শরৎচন্দ্র—কে? ··ও, বড়বৌ। [চায়েব কাপ লইয়া শান্তিদেবী প্রবেশ করিলেন—] চা নিয়ে এলে···! দাও—। কিন্তু, তোমার চোখে জল কেন বড়বৌ?

শান্তি—কই! না তো! তুমিই যেন একটু আগে ককিয়ে উঠলে ব'লে মনে হলো। তাড়াতাড়ি চা নিয়ে ছুটে এলাম—

শরৎ—এ্যাঁ! আমি! আমি!—কই··! না তো···!

শান্তি—চোখের পাতা দুটো ভিজে ভিজে।···তোমার কি ..

শরৎ—ও, তাই নাকি ? তা হ'লে তামাকের ধোঁয়া লেগে বোধ হয় চোখ দুটো হঠাৎ···

[গড়গড়ার নলটি মুখে দিয়া টান দিলেন—]

শান্তি—অসুস্থ শরীরে লিখে যাচ্ছো কেবলি···! আজ না হয় বিশ্রাম নাও তুমি···।

শরৎ—না · না, কি-ই বা আজ লিখলাম। ভাবতে ভাবতেই দেখছি সারাক্ষণ কাটলো···।

শান্তি—তাইতো ব'লছিলাম। দুর্বল রোগা শরীর নিয়ে···

শরৎ—আমি ভালো আছি আজ। ওই দেখো, এতক্ষণ নজরেই পড়েনি আমার। তোমাকে তো আজ বরং অসুস্থ ব'লে মনে হ'চ্চে! নাঃ—বড়বৌ, খাটুনি এবার তোমায় বন্ধ ক'রতেই হবে।

শান্তি—কি যে বলো! আমার আবার খাটুনিই বা কি!

শরৎ—ও কথা বললে তো আমি শুনবো না বড়বৌ! দেখছি তো তোমার কাজ। দেশে-ঘরে যে কী আকাল প্লেগের ব্যামো এলো—মানুষ জন ম'রে উজাড়! পাড়ার এই সমস্ত রোগিনীদের সেবায় তুমি তো পড়েই আছো দিন-রাত্তির! সেবা অবশ্য ভালো। কিন্তু, নিজের শরীরটাও তো তোমায় বাঁচিয়ে চ'লতে হবে। ধরো, যদি একটা কিছু···

শান্তি—[স্নিগ্ধ হাসিতে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়া]—না·· না, ও কিছু নয়। গায়ে আমার সামান্য ব্যথা-ব্যথা—এই যা! ও দুদিনেই সেরে যাবে।—তা যাক, তোমার পায়ের ব্যথাটা এখন কেমন গো? একটু ভালো আছে তো?

শরৎ—[হাসিমুখে]—বেদনা-নিসূদন এই আফিমই ভরসা। [কৌটা হইতে এক বড়ি আফিম চায়ের সঙ্গে গিলিয়া স্বস্তিতে]—

আঃ। যদি এঁর ওপর অচলা ভক্তি রাখতে পারি বড়-বৌ, তো জানবে যে দুর্দিনের ব্যথা আমার কাটবেই কাটবে। ভগবান শ্রীদেবাদিদেব আমাকে বর দিয়েছিলেন যে, বক্তামাশয় না হওয়া পর্যন্ত আমি তাঁর শ্রীকৈলাসে কিছু তই পৌছুতে পারবো না। সেটার যতক্ষণ না সূচনা হ'চ্চে, ততক্ষণ না আমার না তোমার

শান্তি—যাও, কি যা তা হেঁয়ালী যে বরো।

শরৎ—[হাসিয়া]—তাহলে একটু বোসো। গুটিকতো সাংসারিক কথা এই ফাঁকে সেরে নি।

শান্তি—কি কথা গো, সংসারী মানুষ?

শরৎ—কথাটা হচ্চে,—ভাবতেও সত্যি আশ্চর্য হ'য়ে যাই যে, কি ক'রে চালাচ্চো তুমি এই ছন্নছাড়ার সংসার। উপায় তো আমার একরকম ঢু—ঢু। অথচ দুটি পয়সা না পেলে দ'খ আসচি তুমি ..

শান্তি—[হাসিমুখে]—বটে। তা' ভানুমতীর হাতের খেলা তুমি কি ক'রে বুঝবে মশাই? তার চেয়ে এক কাজ করো, ও দরকার নেই তোমার বুঝে-সুঝে, তুমি কেবল তোমার লেখাপড়া আর রোগীর চিকিৎসা নিয়েই বরং থাকো। সংসারের অতো শত খুঁটিনাটি নিয়ে তোমার পুরুষে মাথাটা আর গুলিয়ে ফেলতে যেওনা। এখন বলো—আরেকটু চা দেবো কি তোমায়? চায়ের তেষ্টা তো তোমার দিনরাত মানে না।

শরৎ—কি ক'রে মানবে বলো? চা, আফিম আর তামাক—এই ত্রিগুণের মারাত্মক সমন্বয় একমাত্র আমাতেই যে সম্ভব। জীবনে অনেক হেরেচি অনেকের কাছে, শুধু হার মানিয়েচি ওই আবগারী বেটাদের—

শান্তি—বেশ ক'রেচো। ক্ষোভে কাজ কি, আমি আবার চা আনচি।

[হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। কাগজপত্রে মনোনিবেশ করিলেন শরৎচন্দ্র। একটু পরে মানিকলাল ও শেতলচাঁদ প্রবেশ করিল।]

মানিকলাল—এই যে, দা-ঠাকুর! চট্ ক'রে তোমায় একবার এক্ষুণি যেতে হবে বাপু। দামিনী-টা উদিক বিছানায় প'ড়ে কাটা ছাগলের মতো ছটফট ক'রতেছে!

শেতলচাঁদ—পেলেগের ব্যামো তো লয়!- একেবারে সাক্ষাৎ শমন ও য়ারা! ধ'ল্লি, কল্লাটা না মুড়ে দে ছাড়ে না—হেঁ!

শরৎ—কি সাঙ্ঘাতিক! সকালে তো ওষুধ দিয়ে এলুম! তা কি হ'লো আবার এরি মধ্যে?

মানিক—মাথার আমার কোনো ঠিক নেই দা-ঠাকুর, হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁইধে যাচ্চে ভাবনায় ভাবনায়! তাই একটু হেঁ…হেঁ, আমি আর শেতলা…মানে… [বোতল ধরার ভংগীতে মুখের কাছে ডান হাতটি তুলিয়া ইংগিতে বুঝাইল কথাটা]…… তাই মানে, দামিনী ছটফট ক'চ্ছিলো দেখে, দিচি বোতল খানেক কেরোসিন খাইয়ে। যেম্নি ইঁদুরে রোগ, তেম্নি তার উপযুক্ত জালাবাণ!

শেতল—দেখি, এবার মা হারে কি পুত্তুর হারে!

শরৎ—ইস্-স্! একী ক'রেচো! নাঃ—তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে…। আচ্ছা, চলো দেখি। বড়বৌ…বড়বৌ, আমার ওষুধের বাক্সটা…

[ছুটিয়া গেলেন ভিতরের দিকে। তাহারা বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল সেই দিকে।]

মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কয়েকদিন পরে।

শরৎচন্দ্রের কক্ষ। একটি বেঙুন-প্যাটার্ণের কাঠের সিন্দুক, একটি আলনায় ঝোলানো সামান্য কয়েকখানি কাপড়, একপাশে গড়গড়া ও ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ার একখানা। ভাঙ্গা তক্তাপোষে শরৎচন্দ্রের রুগ্না স্ত্রী শান্তিদেবী চাদর মুড়ি দিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। মাথার দিকে একটি লণ্ঠন টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলিতেছিল। শরৎচন্দ্র শয্যার একদিকে বসিয়া ব্যাকুল নেত্রে স্ত্রীর দিকে চাহিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে গিরীন্দ্রনাথ সরকার ডাক্তার সঙ্গে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শরৎচন্দ্র—এই যে আসুন ডাক্তার বাবু।—বড়বৌকেও যে শেষে প্লেগে ধরলো ডাক্তারবাবু! আপনি যে কোনো উপায়ে বাঁচিয়ে দিন! আপনার কাছে·· আপনার কাছে আমি চিরজীবন···

[অসমাপ্ত কথার মাঝে ছল্ ছল্ চোখে তিনি ডাক্তারের হাত দুটি ধরিলেন]

ডাক্তার—উতলা হবেন না শরৎবাবু, আমার কর্তব্য আমি ভালভাবেই পালন করবো। আপনি শান্ত হয়ে বসুন।

শরৎচন্দ্র—বসো ভাই গিরীন, আর কোথায় বা বসবে··

গিরীন—তুমি ব্যস্ত হয়ো না শরৎদা।

[ডাক্তার রোগিণীকে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিলেন। তারপর উঠিয়া অপাঙ্গে গিরীন্দ্রনাথের দিকে একটি মর্মান্তিক ইংগিত করিয়া তাঁহার সঙ্গে বারেন্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। শরৎচন্দ্রও সেই সঙ্গে বাহিরে আসিতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ শান্তিদেবীর এই সময়

একটু জ্ঞান ফিরিবার মতো উপক্রম হইতেই তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন]

শান্তিদেবী—[এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে শরৎচন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া ক্ষীণ কণ্ঠে]—শোনো · আমার কাছে এসো তুমি। [শরৎচন্দ্র তাঁহার পাশে গিয়া বসিবার উপক্রম করিতেই]—না···না···। এখানে অতো কাছে তুমি বসো না। এ বড় ছোঁয়াচে রোগ···

শরৎচন্দ্র—[আর্তকণ্ঠে]—তুমি অমন করে কথা বল্‌লে বড় ভয় পাই যে বড়বৌ।

শান্তি—[মুখে হাসি টানিতে টানিতে]—ছিঃ, ভয় কিসের! তো-মা-র অনেক অ-বা-ধ্য হয়েচি, সেসব আ-মা-য় তুমি ক্ষমা করো! আমাকে একটু পায়ের ধূলো দাও, আশীর্বাদ করো।

[শরৎচন্দ্র বাধা না মানিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শান্তিদেবী তাঁহার কোলেই শেষ নিঃশ্বাস রাখিলেন। শরৎচন্দ্র নিষ্পলক দৃষ্টিতে স্ত্রীর মৃত্যুবিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সহসা কাঁদিয়া উঠিলেন]

শরৎচন্দ্র—বড়বৌ বড়বৌ·· [মৃতা স্ত্রীর উপর আছড়াইয়া পড়িয়া]—শান্তি···কোথায় গেলে তুমি! ··তুমি যে আমার সকল অবস্থায় সাথী ছিলে।

গিরীন—[ঘরের মধ্যে ছুটিয়া আসিয়া]—শরৎদা··? শরৎদা, ওঠো। শান্ত হও।

শরৎচন্দ্র—[মুখ তুলিয়া]—শান্ত হবো! কিন্তু, কি করে শান্ত হবো গিরীন, বুকটা যে একেবারে শূন্য হয়ে গেলো .ভাই! কোথায় ও চলে গেলো—একদণ্ডে একটা মহাপ্রলয় যে ঘটে গেলো ভাই! আমি·· আমি এখন কি করবো···

গিরীন—পুরুষের বিচলিত হওয়া তো শোভা পায় না শরৎদা। তুমি বিচক্ষণ ব্যক্তি, তুমি শিল্পী—ভেবে দেখো তো, বিশ্বশিল্পীর সমস্ত সৃষ্টিই কি অদ্ভুত আর কেমন সুন্দর, আর তার মধ্যে মৃত্যু শব্দটা কি মারাত্মক আর কতো করুণ! এর আসা-যাওয়ার তাই তো কোনো নির্দিষ্ট কালাকাল নেই শরৎদা।

শরৎচন্দ্র—হুঁ! কিন্তু কি জানো ভাই গিরীন, উপর্যুপরি ভাগ্যবিপর্যয়ে মনটা আমার ভেঙে গেছে! এক এক সময় মনে হয় কাঁদি, চীৎকার করে কাঁদি।

গিরীন—মংগলময়ের জন্যে যদি কাঁদতে পারো শরৎদা তবে...

শরৎচন্দ্র—ভগবান যদি হন মংগলময়, তবে তাঁর রাজত্বে এ অবিচার কেন ভাই? শান্তি পাবো বলেই তো শান্তিকে সঙ্গিনী করলাম, সে শান্তিকে তিনি ছিনিয়ে নিলেন কেন? কোন্ পাপে তিনি ভাঙলেন আমার বুক?

গিরীন—সংসারের নিয়মই যে এই ভাঙা-গড়া! অধীর হয়ো না দাদা। নতুন উদ্যমে বুক বাঁধো, শোকতাপ ভুলে যাও। কর্মময় সংসারে অলসভাবে থাকা কোনোমতেই চলে না।

শরৎ—[ধীরভাবে]—না...তা' চলে না বটে!

গিরীন—আর, তুমি অশান্ত হ'লে ওঁর আত্মাও যে সেখানে শান্তি পাবে না শরৎদা।

[কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শরৎচন্দ্র চকিতের ন্যা: উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর মৃতা পত্নীর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কেমন এক কণ্ঠে তাঁহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন—]

শরৎ—তবে তুমিই শান্তি পাও শান্তি, আর আমি তোমায় বাধা দেবে না। তুমি আনন্দলোকের যাত্রী, অমৃতপথচারিণী। আমি

কান্নার দেশে তুচ্ছ একটা পাষাণ শিলা। পারো যদি—মাঝে মাঝে ফুল হ'য়ে ঝ'রে প'ড়ো এই পাষাণ শিলায়, ফুল হয়ে এসো তুমি···

[আলুথালুভাবে বাহির হইয়া গেলেন সেখান থেকে। গিরীন্দ্র তাঁহার পিছু পিছু সজল চোখে আগাইয়া গেলেন।]

পর্দা নামিল মঞ্চে।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

৫৪, ৩৬নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

শরৎচন্দ্রের পরিবর্তিত বাসাবাড়ি। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ। সময়—সন্ধ্যা। শরৎচন্দ্র তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া গড়গড়া টানিতে ছিলেন। গিরীন্দ্র সরকার প্রবেশ করিতে করিতে ডাক দিলেন—

গিরীন— শরৎদা আছো, শরৎদা ?

শরৎ—কে ? গিরীন ! আরে, এসো এসো, বসো। আজ তোমার অতো হাসি কেন গিরীন ? মঠের জন্যে কোনো বড় শিকার পাকড়েচো নাকি ? প্রিয় বাঁড়ুয্যে খবর পায়নি ?

গিরীন—চুলোয় যাক্ তোমার আফিসের প্রিয় বাঁড়ুয্যে। তাকে আর তোমায় লেলিয়ে দিতে হবে না—সেজন্যে নয়—আমি হাসচি আনন্দের হাসি তোমাকে দেখে।

শরৎচন্দ্র—এ্যাঁ !

গিরীন্দ্র—সেই উদাসী সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ে শরৎদা? সেই দুর্যোগের রাতে সে বৌদির সৎকার করতে গিয়ে ইরাবতীর শ্মশানঘাটে তোমার হাত দেখে সেই যে এক সাধুবাবা বলেছিলেন—তোমাকে দ্বিতীয়বার সংসার করতে হবে…

শরৎচন্দ্র- হ্যাঁ। সে সব দিনের কথা মনে হলে…

গিরীন—কিন্তু, কই? নতুন বৌদি কোথায়?

শরৎচন্দ্র—রান্নাঘরে। গেরস্থালী করছেন।

গিরীন—বেশ, বেশ। তোমার গেরস্থালীতেই তো শুধু পরিবর্তন হয়নি শরৎদা, সব দিক দিয়েই তুমি এখন বদলে গিয়েচো। বস্তি অঞ্চল ছেড়ে হয়েচো শহরবাসী, আমার এ বৌদি হয়েছেন তোমার ঘরের লক্ষ্মী—অন্নপূর্ণা। পশুপক্ষীও তোমার স্নেহের আস্তানায় বেশ ভাগ বসিয়েচে দেখচি।

শরৎচন্দ্র—কিন্তু এতো স্নেহ তো তোমাদের সহ্য হলো না গিরীন! আমার মেজভাই প্রভাস আসানসোলে বেশ দিব্যি চাকরি করছিলো, কি যে তোমাদের সে অনিষ্ট করতো তোমরাই জানো, হঠাৎ তোমাদের রামকৃষ্ণভক্তার দল তাকে বেলুড়মঠে নিয়ে গিয়ে একেবারে সন্ন্যাসী করে তবে ছাড়লে। এটা কি তোমাদের একটা কাজের মতো কাজ হলো গিরীন?

গিরীন্দ্র—[হাসিয়া] তোমার শরৎদা সবই অদ্ভুত। কে কাকে টানতে পারে—নিজের মন না টানলে! এই যে তোমার এতদিনের নিভৃত সাহিত্য সাধনা, বলো দেখি— তোমার মন যদি এদিকে না টানতো তো কেউ কি তোমাকে সাহিত্যে

শরৎচন্দ্র—আর সাহিত্য! কোথা দিয়ে কি হয়ে গেলো যে এই কটা বছরের মধ্যে! ওঃ—১৯১২ সালটা যে কি সাংঘাতিক ছিলো আমার! বইপত্তর নিজস্ব লাইব্রেরী… নারীর ইতিহাস

'চরিত্রহীন'-এর পাণ্ডুলিপি, এমন কি আমার নিজের আঁকা "মহাশ্বেতা' ছবিখানা পর্যন্ত সব পুড়ে নষ্ট হয়ে গেলো!

গিরীন্দ্র—হ্যাঁ, ক্ষতিটা সত্যিই সাংঘাতিক বটে! কিন্তু, 'চরিত্রহীন' তো তুমি আবার লিখেছো। এখন তো তুমি একজন নামজাদা সাহিত্যিক, শরৎদা। এই সেদিন জুবিলি হলে রবীন্দ্র-সম্বর্ধনার জন্যে অভিনন্দনপত্র রচনা করে দিয়ে রেঙ্গুনের বাঙালী সমাজে যা চাঞ্চল্য এনে দিয়েচে···শুধু তাই নয়, বাংলা দেশে এখন তোমাকে নিয়ে রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছে। একে একে তোমার কতগুলো রচনা··

[যোগেন্দ্রনাথ সরকারের প্রবেশ। ইনি শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুন-অফিসের সহকারী, অন্তরঙ্গ ও সাহিত্যিক বন্ধু। আলোচনার শেষের দিকটা তিনি বোধ হয় আসিবার সময় শুনিয়াছিলেন, তাই গিরীন্দ্র-নাথের অসমাপ্ত কথার মাঝেই তিনি যোগান দিলেন—]

যোগেন্দ্রনাথ—···'বড়দিদি, রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, পথ-নির্দেশ, বিরাজ বৌ, বোঝা, কাশীনাথ, চন্দ্রনাথ, পরিণীতা, চরিত্রহীন, পণ্ডিতমশাই, মেজদিদি, পল্লীসমাজ, শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী ··' আরে বাপ্‌রে-বাপ্‌রে · সাহিত্যের বন্যা,···

শরৎচন্দ্র—আরে, যোগেন ভায়া যে! এসো এসো। গিরীনের গিট্‌কিরির মুখে তুমি যে একখানা খাম্বাজী তেহাই সেঁটে দিলে দেখি!

যোগেন্দ্রনাথ—[উপবেশন করিতে করিতে]—তা' সম'-র মুখে ফাঁক পেলে কে আর ছেড়ে কথা কয় বলো শরৎ-দা।

শরৎচন্দ্র—[হাসিয়া]—বেশ, এবার আমিও ছাড়ছি না। ওরে, এঁদের খাবার-দাবার সব দিয়ে যা।

যোগেন্দ্রনাথ—বাঃ। এযে দেখছি বেশ উল্টো চাপ। এখানে এলেই যদি বারে বারে এম্নি ক'রে খাবার দিয়ে আক্রমণ চলে…

গিরীন্দ্র—ওট শরৎদার স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। শরৎদা খেতেও ভালবাসে, খাওয়াতেও ব্যাকুল হয়। দেখো না তার সাক্ষী,—শরৎদার প্রায় সমস্ত রচনার মধ্যে নায়িকার দল নায়ককে পেটপুরে না খাইয়ে কোনোরকমে তৃপ্তি পায় না কখনো।

[তিনজনে হাসিয়া উঠিলেন। ভৃত্য আসিয়া খাবার দিয়া গেল এমন সময়]

শরৎচন্দ্র—নাও, এখন এগুলোর সদ্‌গতি করো দেখি। শরীরের জন্যে এগুলোর সেবন অবশ্য কর্তব্য। এবং, কর্তব্য পালনের ন্যায় বড় জিনিষ সংসারে আর নেই।

যোগেন্দ্র—[হাসিয়া]—কিন্তু, জীবকে অনুতপ্ত হতে হবে না? তৈমিক (ভস্ম থেকে) দেহও নয়, কলির জীবও বটে।

শরৎচন্দ্র—হ্যা। তবে, খুব বেশী সে সম্ভাবনা নেই। উষ্ণম উষ্ণম্ খাবার। তা' ছাড়া, তোমাদের শাস্ত্রেই তো আছে—জঠরেন হুতাশনম্। আমি নাস্তিক হ'লে কি হবে, তোমরা তো আর আমায় ছেড়ে কথা কইবে না।

গিরীন্দ্র—কথার যাদুকর। তোমায় তো আর এঁটে ওঠা যাবে না। শুরু করো ভায়া।

যোগেন্দ্র—[খাইতে খাইতে] যাই হোক—এখন শোনো শরৎদা, আমরা ঠিক করেচি—খুব শিগ্‌গিরই ক্লাবের তরফ থেকে তোমাকে সাহিত্যিক সম্বর্দ্ধনা দেবো।

শরৎচন্দ্র—দেখো যোগেন্দর, সনাতন হিন্দুসন্তান তোমরা। তবে, কেন এতো শিগ্‌গির নীতিবচনগুলো ভুলে যাও?

যোগেন—কি নীতিবচন আবার ভুলে গেলুম!

শরৎচন্দ্র—ভুল্লেই তো তোমরা। কথায়ই তো আছে—'গুজবে কদাচ কান দিবে না, হুজুগে কখনও মাতিবে না।' সব ভুলে এখন তোমরা চলেচো হুজুগে...

[গিরীন্দ্র ও যোগেন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন।]

গিরীন—[হাসিয়া] কথায় কথায় এম্নি 'সাস্‌পেন্স ক্রিয়েট' করতে পারো শরৎদা···

[দুজনের খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল]

যোগেন্দ্র—কিন্তু, এতে আমরা ভুলছি না শরৎদা। তুমি তো জানোই, সাহিত্যিককে শ্রদ্ধার্ঘ দেওয়ার মাধ্যমে সাহিত্যলক্ষ্মীকেই সেবা করা হয়। আমরা রেঙ্গুনপ্রবাসী বাঙালীরা যদি এতে কিছু মাত্র প্রেরণা পাই···

শরৎচন্দ্র—তবে তোমাদের কাছেই বলে ফেলি ভাই,—আর আমাকে শিগ্যির তোমাদের কাছে ব্যাপারটা বলে যেতেও হতো।··· ওই সভাতেই তা' হ'লে হবে আমার এখানের শেষ দেখাশোনা, শেষ বলা-কওয়া তোমাদের সবার সঙ্গে।

যোগেন্দ্র—কি বলচো শরৎ-দা!

শরৎচন্দ্র—খুব শিগ্যিরই রেঙ্গুন ছেড়ে আমাকে কলকাতায় চলে যেতে হ'চ্ছে ভাই।

গিরীন্দ্র—সে কি!

শরৎচন্দ্র—হ্যাঁ ভাই, মর্মান্তিক সত্যি! উপর্যুপরি ভাগ্যবিপর্যয়ে মনটা এখানে আমার হাঁপিয়ে উঠেছে। শরীরও ভালো চলচে না—হজমীশক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলেচি, বাতেও ধরেচে। তার ওপর আফিসের সাহেবের সঙ্গে আদৌ বনিবনা হচ্চে না, সে তো শুনেচো তোমরা।

গিরীন্দ্র—হ্যাঁ, কিন্তু···

শরৎচন্দ্র—'ভারতবর্ষ' কাগজখানা থেকে কিছু মাসিক বন্দোবস্তের আশ্বাস পেয়েছি। দেখি—ভাগ্যে কি আছে। বাংলায় তো ফিরে যাই—

গিরীন্দ্র—শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার সব দিক দিয়েই উন্নতি হোক শরৎ-দা। কিন্তু, তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবে শুনলে সে সব কথা কোনোদিন ভাবতে গেলে…

শরৎচন্দ্র—ভাই গিরীন ভাই যোগেন, আমার মতো ছন্নছাড়া হতভাগ্য সংসারে খুবই কম,—তবুও ভবঘুরে জীবনে যেটুকু সান্ত্বনা পেয়েছি তা' একমাত্র এই বন্ধুদেরই কাছে। কত কষ্টে যে আমাকে সেই আস্তানাটুকু ছাড়তে হ'চ্চে…! ওঃ! সেরে যদি উঠি তো আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে, নইলে এখানেই শেষ বিদায়। এম্নি করে বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা…মস্ত বিড়ম্বনা।

[যোগেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ সহসা অশ্রুছলছল চোখে শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করিতে গেলেন। শরৎচন্দ্র বাধা দিয়া তাঁহাদিগকে জড়াইয়া ধরিলেন।]

মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হাওড়া—বাজে শিবপুর। নীলকমল কুণ্ডু লেনের এক বৈঠকখানায় কয়েকজন ভদ্রলোক আলাপ আলোচনায় মত্ত ছিলেন।

সময়—১৯২৩ খৃষ্টাব্দের এক সকালবেলা।

প্রথম ব্যক্তি—সত্যি, কি বিস্ময়ের ব্যাপার! একটা দুর্ধর্ষ কালাপাহাড়ের মতো সহসা এসে রক্ষণশীল সমাজ-সাহিত্যের উচ্চ সৌধ

একেবারে চুরমার ক'রে দিলেন শরৎচন্দ্র! সাহিত্য হ'লো এবার—সর্বজনীন।

দ্বিতীয়—তাই তো ওদিকে আর্তনাদ উঠেচে। চিন্তায় বাক্যে যাদের চড়া পড়েচে তারা সইবে কি ক'রে বিপ্লব! বলে নবীনের জোয়ারে ঐরাবতেরই পা টলে, সেখানে আবার মশকের পোঁ পোঁ! হেঁ—বিন্দুর অবস্থান আছে, পরিমাণ নেই—কিন্তু চন্দ্রবিন্দুর?

তৃতীয়—নেই-আঁকড়েদের নাকে নাকে!…

[সহসা ঝড়ের বেগে এক ব্যক্তির প্রবেশ। চুল উস্কোখুস্ক, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, হাতে খাতা। সবিস্ময়ে সকলে চাহিলেন সেই দিকে।]

আগন্তক—শোনো। প্রাচীন-পন্থীদের কেমন জবাব দিয়েচি এবার…

[ঢোলকী ছন্দে চারণ ভঙ্গিমায়]

(দাগুড়-গুড় দাগুড় দা)

কী হাওয়া উঠলো দেশে
গোঁড়ামীর পক্ক কেশে,
এক নিমেষে নীতির ধুলো উঠলো বেড়ে।
বুড়ো সব সমাজপতি
দেখো আজ কী ভীমরতি,
কী দুর্মতি—ঝাঁটা হাতে আসছে তেড়ে।
ও বাবা কেমন মরদ
কড়া প্রাণ নাইকো দরদ,
শুধু বদ দপ্‌দপানি কী গ্রাম্ভারী!
না বোঝে লেখার মর্ম

না দেখে জীবনধর্ম,
লোহার বর্ম শুকনো বুকে খবরদারি।
সমাজে জমলো কি পাঁক ?
দাদুরী দেয় জোড়া হাঁক,
আ আ আঁক, কি বিচ্ছিরি। এ কী ব্যাপার!
ও বাবা 'সাহিত্যে স্বাস্থ্য-রক্ষা'—
এ লেখা হবে ফোকা।
না-না না টোকা মারে স্যানিটারি ইনস্পেক্টার।
হায়…হায় সাহিত্যের বন-বাদাড়ে
'ময়্যালের' পুঁছ-আদাড়ে
ও দেখো কলম পাঁড়ে ছড়ায় নীতির ব্লিচিং গুঁড়ো,
তবু কি ড্যাকরা মশা
না মরে বাড়ায় গোঁসা
কি জ্বালা সমাজপতির রক্ত চোষা নিদান গুঁড়ো।
হা-হা হা হায় কি করি
ভাঙা পা লেঙ্চে মরি,
বিষম অরি শাড় হাবাতে যুবকগুলো,
ও গিন্নী, দাওতো লাঠি
ছোঁড়াদের বাঁধন কাটি,—
যতো সব ছিষ্টিমাটি কর্মনাশা লম্বা-চুলো।

সকলে—সাবাস। সাবাস। চমৎকার। আরে, দেশ যাকে সাগ্রহে দিতে চায় অভিনন্দন ·

আগন্তুক—হ্যাঁ, শোনো আর একটি মজার ঘটনা। দিন কয়েক আগে একটা অখ্যাত অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে প'ড়ে আমি 'কত্ত অপূর্ব অভিনন্দন দিতে দেখেচি শরৎবাবুকে।

প্রথম—তাই নাকি! কারা দিচ্ছিলেন? শরৎবাবুকে তাঁরা নিয়ে গিয়েছিলেন বুঝি?

আগন্তুক—না, তিনি যান নি বটে, তবে তাঁর সৃষ্টির নিভৃত সম্বর্ধনা দিচ্ছিলেন এক বৃদ্ধ বৈঠকখানায় ব'সে হুঁকোটানা মুলতুবী রেখে।

প্রথম—বটে, বটে!

আগন্তুক—দূর থেকে দেখে ভাবলাম রামায়ণ মহাভারত পড়ছেন বোধ হয়, তাই বৃদ্ধের চোখে জল! কিন্তু না, কাছে গিয়ে দেখি কি একটা চটি বই।—জিগ্যেস ক'রতে বললেন, 'নিষ্কৃতি'—কে একজন শরৎচাটুয্যে লিখেচেন। বলিহারি হাত বটে চাটুয্যেমশায়ের। রামায়ণ আমার নিত্যসঙ্গী—বাল্মীকি ব্যাসদেব দেবতা আমলের লোক, তাদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম! কিন্তু, এই মানুষটা যেন আমাদের আপনার লোক বাবা। একবার দেখতে ইচ্ছে হয় তাঁকে—সংসারের সুখ দুঃখের কথাটি এমন আন্তরিকভাবে বলেচেন…

সকলে—বাঃ! বাঃ! তারপর?

আগন্তুক—জিগ্যেস করলুম, এ বই পেলেন কেমন ক'রে এখানে? ক্লাব-লাইব্রেরী তো নেই মনে হয় এগাঁয়ে? বললেন, না বাবা ওসব বুঝি না…ওসবও নেই এখানে। আমার নাতি চাকুরী করে কলকাতায়, সে বইখানা এনে ঘরে রেখেছিলো। সেদিন কি একটা খোঁজ করতে গিয়ে ওর ঘরে দেখলুম বইটা। ভাবলুম, দেখি কি বই পড়ে আজকালকার ছেলেরা। কিন্তু তোমারে আর কি বলবো বাবা, তুমি সন্তানতুল্য,—দু'একটা পাতা পড়তেই দেখি কি আমার চোখ দুটো

একেবারে বাতাসা-পাকের চিট্‌কাটা গুড়ের মতো অক্ষরগুলোর সঙ্গে জমজমাট হ'য়ে গেছে !

সকলে—[সহাস্যে] ভারি মজা তো !

আগন্তুক—হ্যাঁ। বৃদ্ধ ব'লে চল্লেন—'নাতি যে আমার পেছনে কখন দাঁড়িয়েছিলো তা লক্ষ্য করিনি। সে ব'ল্লে—তোমার ভালো লাগছে দাদু ! বেশ, ওখানা তুমি শেষ করো। শরৎবাবুর লেখা আরো বই তোমায় পড়াবো। 'বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, পল্লীসমাজ, পণ্ডিতমশাই'—এসব বইও তোমার ভালো লাগবে।'—বৃদ্ধ পাঠকের আন্তরিকতা দেখে সত্যি সেদিন মুগ্ধ হ'য়েছিলাম আমি !

প্রথম—রামায়ণের পাশে শরৎ-সাহিত্যের গণ আসন ! কি দরকার তবে শুধু কয়েকজন পণ্ডিতের অনুমোদন, কিসের অপেক্ষা !

আগন্তুক—সত্যি ! দেশবন্ধু চিনেছিলেন এই শরৎচন্দ্রকে। 'নারায়ণ' পত্রিকায় ওঁর গল্প ছেপে পারিশ্রমিক হিসাবে একবার নাকি একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক্ পাঠিয়েছিলেন সই করে। কিন্তু, একশো টাকার বেশী উনি তাতে বসাতে কিছুতেই রাজি হন নি।

দ্বিতীয়—মানুষটিকে চিনেছিলেন ব'লেই তো তিনি ওঁকে দেশের কাজে টেনে আনলেন। ওঁদের মতো ব্যক্তির কাজ আর কলম দুটো না ধরলে যে দেশের মুক্তি নেই ভাই। ওঁরাই তো এযুগের সব্যসাচী !

আগন্তুক—এই সব্যসাচী-ই আবার আমাদের হাওড়া কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট। সুভাষবাবুও ভয়ানক শ্রদ্ধা করেন ওঁকে। শুনেচি, কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করেন। হাওড়াবাসী হয়ে এখন আমরা গর্ব বোধ করতে পারি।

প্রথম—সত্যি, তাই বটে। আচ্ছা, শরৎচন্দ্র তো সি-এস-পি-সি-এ'র সভাপতি ?

দ্বিতীয়—হ্যাঁ। জীবজন্তুর ওপর ওঁর ভীষণ দরদ। ভেলি ব'লে একটা গাঁটচটা কুকুর আবার ওঁর বাড়িতে আছে। ও'র সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলে প্রথমে ভেলির দাঁতমলা সহ্য করতে হবে তোমাকে !

প্রথম—[হাসিয়া]—বাঃ ! এওতো এক জ্বালা !

দ্বিতীয়—সংসারে জ্বালার যে কতো রকমারি আছে ! একবার এক পালোয়ান কুকুরের মুখ থেকে একটা ঘিয়েভাজা কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে উল্টে সেই নেমোকহারাম কুকুরটাই শরৎবাবুর হাতে দাঁত ফুটিয়ে দিয়েছিলো !

প্রথম—[সহাস্যে]—এদেশের বিদেশী শাসকের মতো দেখি। যে লাঠি দেয়, তাকেই লাঠিপেটা করে।

আগন্তুক—বাদ দাও ওসব কথা। আমি ভাবচি কি জানো ? গেলো বছর টমসন সাহেব তো 'শ্রীকান্তে'র প্রথম পর্ব অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করলেন—। দুদিন বাদে বিলেতে ওটা বিভিন্ন ভাষায় হয়তো অনুদিত হ'য়ে এই ভারতীয় সাহিত্যিককে নিয়ে একটা হৈ হৈ প'ড়ে যাবে ! কিন্তু, আমাদের ক'লকাতা ইউনিভার্সিটি কেন এখনো শরৎচন্দ্রকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না !

সকলে—তাইতো ! সত্যি, ভাববার কথা বটে !

[সহসা খবরের কাগজ হাতে জনৈক ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন।]

জনৈক ব্যক্তি—দেখেচো আজকের কাগজ ? সুসংবাদ আছে হে—।

ইউনিভার্সিটি তো শরৎবাবুকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' দেওয়ার প্রস্তাব নিয়েচে।

[সকলে সস্মিতমুখে চাহিলেন]

আগন্তুক—ওই আলোচনা-ই তো করছিলুম এতক্ষণ!

জনৈক—আলোচনার শেষ। এখন চলো শরৎবাবুর বাড়ি। প্রণাম জানিয়ে আসি। এতো কাছে তো আর বেশী দিন পাবো না ওঁকে···

সকলে—কেন··কেন!

জনৈক—সামতাবেড়ে ওঁর বাড়ি তৈরি শেষ হয়ে এলো ব'লে·

সকলে—তাই নাকি! চলো··চলো···।

[প্রস্থান]

মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

সামতাবেড়। হাওড়া—পানিত্রাস। শরৎচন্দ্রের বহির্বাটীর সম্মুখস্থ বারেন্দা। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের এক অপরাহ্ন। শরৎচন্দ্র ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় নিমীলিতনেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন। বাম হাতে ধরা গড়গড়ার নলটি আলগাভাবে কোলের উপর পড়িয়াছিল। সম্মুখে রূপনারায়ণের জলে বিলীয়মান রবিরশ্মির বিচিত্র রূপতরঙ্গ। আর তারই তালে তালে সমতা রক্ষা করিয়া কতকগুলি নৌকা পাল তুলিয়া এদিক-ওদিক চলিয়াছে। শরৎচন্দ্র স্বপ্নভাঙা অবস্থায় সহসা জাগিয়া কোলের উপর হইতে নলটি লইয়া কয়েকটি টান দিলেন, তারপরে ডাক দিলেন—

শরৎচন্দ্র—ওরে, কে আছিস্‌রে, তামাক দিয়ে যা।

[ভৃত্য ননী প্রবেশ করিল।]

ননী—একটু আগেই তো দিয়ে গেছি বাবু !

শরৎচন্দ্র—[পুনরায় টানিয়া]—টানলে ধোঁয়া বেরোয় না, দিয়ে গেছি বাবু !

ননী—[হাত কচলাইতে কচলাইতে বিব্রতভাবে]—সাজা তামাক পুড়ে গেছে। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন যে।

শরৎচন্দ্র—হ্যাঁ, ঘুমিয়েছিলুম বৈকি ! বললেই হলো। সামনের ওই পালের নৌকোগুলোকে গুণে গুণে মুখস্থ করে ফেললুম—বলে ! ব্যাটা মিথ্যেবাদী কোথাকার। দে বলচি শিগ্গির সেই দিল্লী থেকে আনা বড় কল্‌কেটায় সেজে, যেন এবেলার মতো আর না নেবে।

[ননী হাসিমুখে চলিয়া গেল। শরৎচন্দ্র টিপয়ে রক্ষিত বই-পত্রের দিকে সতৃষ্ণদৃষ্টিতে চাহিলেন। ননীতামাক দিয়া গেল এবং একটু পরে পুনরায় প্রবেশ করিয়া একতাড়া পত্র-পত্রিকা পাশের ছোট টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। শরৎচন্দ্র কাগজপত্রগুলো দেখিতেছিলেন, এমন সময় হিরণ্ময়ী দেবী সেখানে আসিলেন।]

শরৎ—[মুখ তুলিয়া]—এই যে বড়বৌ, এসো।

হিরণ্ময়ী—এমন চুপটি ক'রে ব'সে ব'সে কি ভাবচো ?

শরৎ—ভাবচি ! কতো কথা—! জীবনের সায়াহ্নে এসে আজ মনে পড়চে ছেলেবেলার সেই সদাচঞ্চল দিনগুলো ! মনে পড়চে —সেই ডিঙরীর খাল। সারাটা সকাল খালের পাড়ে পাকা খিরনী কুড়োতাম, আর ফাঁস দিয়ে ধরতাম গিরগিটি ! ওঃ— সে আজ কতকালের কথা ! রেল হয়নি তখন—ষ্টীমারে চেপে ঢেউ দেখতে দেখতে সেখানে যেতে যে কী আনন্দ হ'তো

বড়বৌ! সামনে পড়তো বুঝি সতীচওড়া ঘাট! নিটোল স্বাস্থ্য সুন্দর ছেলে-মেয়ে সকালের মিষ্টি আলোয় লাফিয়ে লাফিয়ে খেলতো সেথায়। কি নির্মল প্রাণ-চাঞ্চল্য।

হিরণ্ময়ী—বাঃ, বেশতো!

শরৎ—হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে। নেই শুধু আমার সেই দেহ আর সেই মন। সবার আড়ালে আমিই শুধু নিঃশেষ হ'য়ে গেলাম বড়বৌ।

হিরণ্ময়ী—নিঃশেষ হ'য়ে গেলে!

শরৎ—গেলাম বৈকি। ভবঘুরের মতো সারা জীবনই তো ঘুরলাম—দেবানন্দপুর.. ভাগলপুর...খঞ্জরপুর মজঃফরপুর.. -রেঙুন—কত জায়গার কত রকমের কান্না শুধু এই শুকনো বুকে এসে জমাট বেঁধে রইলো বড়বৌ! কাউকে কিছু দিতে পারলাম না...

হিরণ্ময়ী—অমন করে বলোনা তুমি।

শরৎ—তোমাকে কি সুখী ক'রতে পেরেচি বড়বৌ? কি ব্যবস্থাই বা করলাম তোমাদের!

হিরণ্ময়ী—ও কথা কেন? তোমাকে নিয়েই তো আমার সমস্ত সুখ, সব কিছু আনন্দ! কোন্ ব্যবস্থাই বা বাকী রেখেচো কার জন্যে? এখানে বাড়ি হ'লো...কলকাতায়ও বাড়ি তৈরী হতে চলেচে। [সস্নেহে মাথার চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে] ও কথা থাক। শরীরটা কি আজ বেশী খারাপ লাগছে তোমার?

শরৎ—শরীর। খারাপ কি? দিনরাত শুয়ে শুয়ে কাটাচ্চি। বাঁ পা খোঁড়া. ডান কানে তালা ধরেচে, অর্শের কল্যাণে অকেজো রক্তগুলো নিয়মিত বেরিয়ে যাচ্চে

হিরণ্ময়ী—একবার ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠাই তবে। দেখুক এসে।

শরৎ—না···না, থাক। এখনি ডাকার মতো তো কোন অবস্থা হয়নি। তারচেয়ে এক কাজ করো বড়বৌ, সুরেনমামাকে একবার আসতে বলা যাক্। খোকা কোথায়—প্রকাশ?

হিরণ্ময়ী ঠাকুরপো ওদিকে নতুন কাপড়গুলো ঠিক করে সাজাচ্ছেন! গাঁয়ে শিগ্যির বিলিব্যবস্থা তো করতে হবে।

শরৎ—আহা, একলা বেচারা! যাই দেখি, ওকে একটু সাহায্য·

হিরণ্ময়ী—এই শরীর নিয়ে তুমি আবার ওসবের মধ্যে কেন যাবে বাপু? আমিই দেখচি

[বাহির হইতে কে ডাকিল—'দা-ঠাকুর···']

—ওই আবার কারা ডাকচে।

[প্রস্থান। কয়েকজন গ্রাম্যলোকের প্রবেশ]

গৌর মাঝি—আর যে গাঁয়ে থাকতে পারলুমনি দা-ঠাকুরগো! রোজগারের পথ যে একেবারে গেলো! বাপপিতামোর আমলের শিবোত্তর জলকরটা জমিদারের কাছ থেকে নতুন পত্তনী লিলে কেষ্টোবাগ। উ যে এখন জবর দখল করতে চায় গো!

শরৎ—[খাড়া হইয়া বসিয়া]—হুঁ। চলছিলো এতদিন দেওয়ানি, এবার ফৌজদারিতে না এনে দেখাচ ছাড়বে না ওরা

গৌর মাঝি—কি করি এখন দাঠাকুর। এগিয়ে যেতেই তো ওদের লোক ঘুঁগরি মেরে তেড়ে এলো। মোদের যৎপরোনাস্তি গালাগাল করলে, ওরি মধ্যে ক'জন মুহূর্তে সারা বাঁধটাও যে কেটে দিলে! কি হবে এখন দা ঠাকুর গো!

শরৎ—তা আমি কি করবো, কি কত্তে এসিছিস আমার কাছে? নিজের হক্কের জিনিষ কেড়ে খাবে অপরে, আর অপদার্থের

মল শুধু ঘরের কোণে বসে নাকে কাঁদবে। সরে যা আমার সুমুখ থেকে। কান আমার ঝালাপালা হয়ে গেলো! যা… যা…

গৌর মাঝি—তুমি রাগ করলে আমরা যে মরে যাবো গো দা-ঠাকুর। ওরা ভয়লক্ (ভয়ানক) দলে ভারী, আমাদের নরুসর্দারকে ইরি মধ্যে পেড়ে ফেলেছে যে গো!

শরৎ—[থম্‌থমে মুখে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া]—থানায় গিছলি তোরা?

গ্রামবাসী—পেরথমে তো তোমার কাছেই ছুটে এলুম পিতিবিধেন জিগ্যেস্ কত্তে।

শরৎ—[উঠিয়া চিন্তিতভাবে কয়েকবার পায়চারি করিয়া]—যা, তবে এখুনি গিয়ে ডায়েরী লেখা থানায়, তারপর কাল তখন… [তাহারা চলিয়া যাইতেছিল—] আচ্ছা… না থাক… এখন বাড়ি যা তোরা! [বিস্মিতভাবে তাহারা পুনরায় গমনোদ্যত] … দাঁড়া, একখানা… [কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিলেন] এই চিঠিখানা ঘোষালমশায়ের হাতে দিস্। ওদের জানা দরকার যে হাতে পেলে অতো সহজে আমি ছাড়ি না।

গৌর মাঝি—কিন্তু ওই কেষ্টোবাগকে যদি আমি খুন না করিতো…

[চিঠি লইয়া সকলে চলিয়া গেল। ননী আসিয়া তামাক দিল। শরৎচন্দ্র পায়চারি করিতেছিলেন ভ্রূক্ষেপবিহীনভাবে। তামাক পুড়িয়া যাইতেছিল—]

শরৎ—গৌর… গৌর…! আঃ…। না, সেজকত্তাকে ডেকে পাঠাতে হয় একবার।

ননী—বাবু, তামাকটা যে…

শরৎ—আঃ! তোকে এত গালাগাল করি, তবু কি তোর এখানে চাকরী না ক'ল্লে চলে না! যা—তোকে এখুনি জবাব দিলুম।

[ননী মুখ টিপিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে চলিয়া গেল। পায়চারি করিতে লাগিলেন শরৎচন্দ্র।]

শরৎ সংসারে যারা শুধু দিলে, পেল না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেল না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই, এদেরই বেদনা দিলে আমার মুখ খুলে—এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার কত দেখেছি নির্বিচারের দুঃসহ সুবিচার···

[সরোজ বাব প্রবেশ করিলেন। দুজনের সঙ্গে চোখোচোখি হইল।]

সরোজ আপনাকে আজ একটু উত্তেজিত মনে হচ্ছে শরৎদা?

শরৎচন্দ্র—[ম্লান হাসিয়া] উত্তেজিত! কই, না। শিরদাঁড়া যার ভেঙেছে, সে তো নিথর, নিরুত্যক্ত।

সরোজ—কিন্তু, ওদের তো জানাতে হবে।

শরৎচন্দ্র—কে কাকে জানাবে ভাই? আবেদন নিবেদনের পালা পূর্বেই শেষ হয়ে গেছে, এ যুগটা আত্মবলিদানের যুগ। যেমন দেশের জমিদারশ্রেণী··তেমনি এদেশের বিদেশী শাসক। ওদের দয়া নেই, মায়া নেই, চোখ চেয়ে দেখেনা কখনো কেমন করে এই বাংলাতেই দশ লক্ষ লোক শুধু ম্যালেরিয়াতে শেষ হয়ে যায়। অথচ দেখো, এদেশে কত যুদ্ধ জাহাজ! কতো দাম তার জানো? শুধু এর একটার খরচে এদেশের এই দশ লক্ষ সন্তানহারা মায়ের চোখের জল চিরদিনের জন্যে মুছিয়ে দেওয়া যায়! শিল্প গেল, বাণিজ্য গেল, ধর্ম গেল—নদীর

বুকে জাগলো মরুভূমি! চাষী আজ পেট পুরে খেতে পায় না ...শিল্পী মজুরী করে বিদেশীর দুয়ারে! অন্ন নেই...বস্ত্র নেই...গোধন নেই— দেখেচো, দেখোচো কি কখনো এক ফোঁটা দুধের অভাবে জীর্ণা মায়ের শীর্ণ বুকে মুখ লাগিয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে থাকতে এদেশের পুঞ্জ পুঞ্জ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে...

[অকস্মাৎ আবেগে স্তব্ধ হইয়া ইজিচেয়ারে এলাইয়া পড়িলেন।]

সরোজ—শরৎ-দা, শরৎ-দা!...

শরৎচন্দ্র—[কিছুক্ষণ পরে সামলাইয়া লইয়া] জানো, প্রতিবাদ করলাম আমি তীব্রভাবে। আমাদের পাপ..আমাদের পুঞ্জীভূত অপরাধ...আমাদের পরাধীনতা..আমাদের এই নিঃশেষিত অবস্থার কথা বিশ্লেষণ করে এই সমস্ত কথাই দেশবাসীর সম্মুখে তুলে ধরে ব'ল্লাম আমি। লিখলাম তাই—পথের দাবী সরকার করলে বাজেয়াপ্ত।

সরোজ—আমাদের এ জাতকে একেবারে ঢেলে সাজাবার জন্যে তাইতো আপনার এই লেখারই প্রয়োজন শরৎ-দা। তারা পাবে আনন্দ, পাবে শক্তি সাহস...

শরৎচন্দ্র—কোথায় সেই সাহস? কোথায় দেশবাসীর সে অভ্যুত্থান? কাকে দেবো আনন্দ? কি হবে আর লিখে? পাবার অধিকার আগে এরা অর্জন করুক। বলিদান আগে সম্পূর্ণ হোক্ তারপর অনেক লোক জন্মাবে, লিখে স্তূপাকার করবে তখন...!

সরোজ—কিন্তু, এই দুর্দিনে এই উত্তাল তুফানে আপনার মতো সাহিত্যিকরাই তো শুধু হাল ধরতে পারেন শরৎ-দা।

শরৎচন্দ্র— না ভাই,...সংস্কারের বিষম ঘূর্ণিতে হাতের হাল বারে বারে পর্যুদস্ত হয়ে যাচ্ছে ! জোড়াতালি মেরামতি দিয়ে কোনো কিছুর পরমায়ু দীর্ঘ করা যায় না। 'পথের দাবী'তে তা আমি বোঝাতে চেষ্টা করেচি। অতীতকে নিয়ে কেবলি হৈচৈ করে আমাদের বর্তমান দৈন্যকেও চাপা দেওয়া যায় না। এমন অনেক ছেলে দেখা যায়, যারা নিজের জোরে অ.স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে, অথচ বংশ-পরিচয় তার অতি ক্ষীণ। আমার 'শেষ প্রশ্ন' বইতে এই বিষয়েরই অবতারণা করেচি. করেচি আমি অনেক কিছুতেই কটাক্ষ। আজ সাহসী বলে বড়াই করি আমরা, কিন্তু বলতে পারো— কেন তবে আমরা এতো অবনতির স্তরে নেমে যাচ্ছি ? কেন একবার পাঠান. একবার মোগল, একবার ইংরেজের জুতোর তলায় পিষে মরচি ? পৃথিবীর সমস্ত জাতি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে, আর আমরা সংস্কারের প্রাচীন ঠুলি পরে বলচি— অহো. আমরা কি· কেমন সংস্কারকের জাতি !

সরোজ—এর কি কোনো সমাধান নেই !

শরৎচন্দ্র— আছে হয়তো। তবে সে কাজ আমার নয়। আমি সাহিত্যসেবী— আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে আমি সমস্যা তুলে ধরি দেশবাসার সামনে. সমাধানের ইঙ্গিত দি। গ্রহণ করা না করা তাদের। কংক্রিট রচনায় কল্পনা চলে না, সত্যিকারের জীবন দেখতে গেলে শুচিবায়ুগ্রস্ত হলে চলবে না। অন্ততঃ. গোর্কি, টলষ্টয়, শেক্সপীয়রের তা ছিলো না। কবি চিত্রকর গ্রন্থকারের জীবন তাই সাধারণের থেকে ভিন্ন। অভিজ্ঞতা কুড়োতে চাই, অথচ শান্তশিষ্ট জীবন যাপন করবো, তা হয় না। এদেশের সমালোচকেরা জানে না যে এঁদের

স্নেহের প্রশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, নইলে শিল্প সাহিত্য গড়ে ওঠে না। আমাদের দেশের সমালোচকেরা সমালোচনা করেন মানুষটার, বইটার নয়— ব্যক্তিগত ইঙ্গিতই বারো আনা থাকে তাঁদের লেখায়। এইটেই ব্যথার বিষয়।

সরোজ— আচ্ছা, মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার এতো জ্ঞান কেমন করে সম্ভব হলো শরৎ-দা?

শরৎচন্দ্র— বলেচি তো, আর্ম-চেয়ারে বসে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। অতি কুৎসিৎ নোংরামির মধ্যেও এতো মনুষ্যত্ব দেখেচি যা কল্পনা করা যায় না। কোন কয়লার খনি থেকে যে কখন কি হীরামানিক ওঠে··। জানো, ছেলেবেলায় একবার আমি ছ' সাতশো কুলত্যাগিনীর ইতিহাসও সংগ্রহ করে ছিলাম···! দেখেচি—যথার্থ ভালোবাসলে মেয়েদের শক্তি আর সাহস পুরুষের চেয়ে ঢের বেশী বেড়ে যায়। কোনো কিছুই তারা তখন গ্রাহ্য করে না। তাইতো হতভাগিনীদের শুধু পেতে হয় লাঞ্ছনা আর অবিচার।

সরোজ – আপনি আবার লিখুন শরৎদা। দেশ আপনাকে এখনো চায় ব্যাকুলভাবে।

শরৎচন্দ্র – এককালে কতো উৎসাহ ছিলো আমার। [একটু থামিয়া] তোমাদের কথা শুনে আর পাঠকের উৎসাহ দেখে···অবশ্য, নরেন ও তার কাগজের জন্যে রীতিমতো তাগাদা দিচ্চে, সৌরীন বলচে 'অরক্ষনীয়া'র নাট্যরূপ দেবে! বিচিত্রা'র জন্যে উপীন ও খেয়ে ফেলচে—আর সবার ওপরে তো আছেন জলধর দাদা!·· কিন্তু না, আমায় দিয়ে আর বুঝি কিছু হয়ে উঠবে না সরোজ।

সরোজ— কেন·· কেন শরৎদা?

শরৎচন্দ্র—কঠিন রোগে ধরেচে ! যে মনে যে বুকের জোরে আমি লিখবো, সে বুক আমার ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেছে। এখানেই শেষ নিঃশ্বাস রেখে গেছে আমার ভাই প্রভাস, স্বামী বেদানন্দ ! এবার শিগ্গির আমায়ও পালাতে হবে···

সরোজ—কিন্তু···

শরৎচন্দ্র—না···না···না, এর মধ্যে আর কোনো কিন্তু নেই ! আমি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ! জীবনটা বড় পুরনো···বড় বিস্বাদ হয়ে গেছে ! মুক্তি চাই···মুক্তি চাই আমি···

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে উঠিয়া গেলেন। সরোজ অবাক বিস্ময়ে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।]

নিবিয়া গেল মঞ্চের আলো।

সমাপিকা

ঘোষক : কিন্তু, মুক্তি কি পেয়েছিলেন শরৎচন্দ্র ! মুক্তি তো তিনি পান নি।—দরদী শরৎচন্দ্র বাঁধা পড়লেন বিদগ্ধ মানুষের হৃদয়ের বন্ধনে। শরৎ-সাহিত্যে ঝিলিক দিলো শরৎ-জীবনালেখ্য। জীর্ণ সমাজের শত জর্জর চন্দ্রাতপ ভেদ ক'রে দিকে-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়লো শারদ স্নিগ্ধ আলো ! এ আলো আশার এ আলো ভাষার এ আলো লক্ষ লক্ষ নবীন প্রাণের প্রদীপ। জনতা এতদিনে চোখ মেললো·· চললো শ্রদ্ধা-হোম-মঞ্চে। পুরোধা রবীন্দ্রনাথ।

[স্তব্ধ হইল ঘোষণা। পাদ-প্রদীপ জ্বলিল অন্ধকার মঞ্চে। দেখা গেল মঞ্চের একদিকে অবতরণিকার সেই অগ্নিকুণ্ডের দৃশ্য। বহ্নি নির্বাপিত—প্রদীপ্ত শরৎচন্দ্র শুধু সেখানে দণ্ডায়মান।

ওদিকে মঞ্চের পটভূমে এক উদ্যানের দৃশ্য। পত্রপুষ্প-সমন্বিত তরুতল। আলোর ঝলকে সহসা সেখানে ভাসিয়া উঠিল শান্ত সুন্দর রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। পশ্চাতে অনুরাগী জনসাধারণ। প্রতিধ্বনিত হইল রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ।

সচকিত শরৎচন্দ্র চাহিলেন সেই দিকে। বিস্ময়-শ্রদ্ধাজড়িত অন্তরে পথ-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া তাঁর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন আনত ভংগীতে।
অন্ধকার হইয়া গেল ওদিকের অগ্নিকুণ্ডের দৃশ্য।]

রবীন্দ্রকণ্ঠ :—

"…শরৎচন্দ্র—

…তোমার সাহিত্য-রসসত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত,…তাই জয়ধ্বনি করতে এসেছে তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।…জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ— শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়-রহস্যে। অন্য লেখকেরা অনেক প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি।…সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে…কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি।"

[জনৈক অনুরাগী শরৎচন্দ্রের কণ্ঠে মালা পরাইয়া দিলেন।]

ঘোষক : আর কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা জানাই শরৎ-বন্দনা :

—সম্মেলক গান—

(দেশ—একতালা)

'নন্দিত তুমি শরৎচন্দ্র, বন্দিত তুমি হে রূপকার,
মানবমনের গহন বনের হে মহাসাধক কল্পনার!
চিত্তকাননে শেফালী করবী
অপরূপ রূপে ফুটাইলে কবি,
নিকষ-নিবিড় তিমির গগনে বিরচিলে ছবি চন্দ্রমার!
পঙ্কের মাঝে যে ছিল মলিন
করিলে তাহারে পঙ্কজিনী,
তোমার প্রভায় পাপ-মেঘ গায়
জাগিল সুপ্ত সৌদামিনী!
হে মরমী সখা, বন্ধু সুজন,
লহ হে মোদের এ প্রীতি-পূজন,
লহ প্রণয়ের মিলিত মনের প্রীতি-সুরভিত নমস্কার!!'

যবনিকা

শরৎচন্দ্রের

প্রথম আলো ঃ ৩১শে ভাদ্র, ১২৮৩
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬

শেষ দীপ্তি ঃ ২রা মাঘ, ১৩৪৪
১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৮

প্রথম অভিনয়

রঙমহল

১৯৫৪

পরিচালনা : সলিল সেন

ব্যবস্থাপনা : নেপাল নাগ

প্রযোজনা : শরৎ সাহিত্য সম্মেলন

সম্মেলনের সংগঠনকারিগণ

সভাপতি—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সহ-সভাপতিগণ—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, কালিদাস রায়, শচীন সেনগুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, বিভূতি ভট্ট, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, সুকমল ঘোষ, অশোককুমার সরকার।

পরিচালক—পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ—প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

যুগ্ম-সম্পাদক—দুর্গাপদ ভট্টাচার্য, তপনকুমার সেন

সদস্যবৃন্দ—আশাপূর্ণা দেবী, বাণী রায়, প্রতিভা বসু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র কাজী আবদুল ওদুদ, অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ বসু, দক্ষিণারঞ্জন বসু, প্রাণতোষ ঘটক, সুধীর সরকার, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য, রাজেন সরকার, মণীন্দ্রনারায়ণ রায়, মণীন্দ্রনাথ রায়, অরবিন্দ বেদজ্ঞ।



নন্দদুলাল চক্রবর্তী

শরৎচন্দ্রিকা

B. C. Chakraborty

"শ্রীযুক্ত নন্দদুলাল চক্রবর্তী শরৎচন্দ্রের জীবনী নিয়ে এই নাটকখানি রচনা করেছেন। নাটকটি রঙমহলে অভিনীত হয়েছিল শরৎ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে। শরৎচন্দ্রের জীবনে নাটকীয় ঘটনা যথেষ্টই ছিল, কিন্তু তার সবটাই যে ঠিক নাটকের উপস্থাপনার যোগ্য এমন কথা বলা যায় না। নন্দদুলাল বাবুও সে চেষ্টা [illegible]ন নি। তিনি শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস থেকেও উপাদান আহরণ করেছেন। তাতে ভালই হয়েছে। লেখকের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা মনন চিন্তনের ভিয়ানে পাক হয়ে তবেই সাহিত্যের রসরূপ পায়। তাতে বোধ করি লেখকের আন্তর পরিচয় বেশি করে ফোটে। শরৎচন্দ্রের রচনার মধ্যে তাই আসল শরৎচন্দ্রের জীবনী নিহিত।

নন্দদুলাল বাবুর রচনা আমার ভালো লেগেছে। আরো অনেকের লাগবে আশা করে আমি এই কথা কয়টি লিখে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের দরবারে স্বাগত জানাই।"

ডঃ সুকুমার সেন, এম. এ,
পি. এইচ. ডি., এফ. এ. এস
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক
ও 'লিংগুইষ্টিক সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া'র
সম্পাদক।

"...নাটকখানি আমি প্রায় সবটাই পড়েছি এবং বইখানির সম্বন্ধে লেখকের সহিত মাঝে মাঝে আলোচনাও করেছি।

সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে বইখানির মূল্য নিশ্চয়ই আছে। নাটক হিসাবে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হলে দর্শকগণ একটা আনন্দের খোরাক পাবেন সে কথা নিশ্চয় বলতে পারি।"

—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,
'বিচিত্রা'র ভূতপূর্ব সম্পাদক ও
সম্পাদক 'গল্প-ভারতী'।